প্রথম মৃত্যুর আগে দ্বিতীয় জন্ম

– সাদাফ মনজুর

রাতে বাড়ি ফিরে বাবা সবাইকে জানিয়ে দিলেন, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, পাকিস্তান সরকারের অধীনে আর চাকরি করবেন না। আমাদের সকলকে নিয়ে পালিয়ে যাবেন। পরনের কাপড়-চোপড়সহ হালকা যা কিছু মালামাল নেয়ার মতো বেধে ছেদে নিতে বললেন। যেহেতু জীবন বাচানোর যাত্রা। ফলে ভারী মালামালের মায়া ছাড়তে হবে।

একটি একটি করে দীর্ঘ দিনের সাজানো সংসার, তবু সেসবের মায়া ছেড়ে মা গৃহ ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

কোন পথে কোন বাহনে যাবো সে ব্যবস্থা বাবা তখনো ঠিক করেননি। তবে পালানোর ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন বাবা। আমরা তখন নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানা কোয়ার্টারে থাকতাম। পরদিন বাবা সকলকে সেখান থেকে দশ ঘরিয়া নামে এক গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। থানা থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরত্বে চলে এলাম। যে বাড়িটায় গিয়ে আমরা উঠলাম সে বাড়ির গৃহিণী আমার বাবাকে *ধর্ম পিতা* মানতেন। সেই সূত্রে আমরা আমাদের বড় বোনের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম দিন কয়েকের জন্য।

আমাদের সঙ্গে বাবা আসেননি। ফলে তাকে নিয়ে আমরা ছিলাম ভীত ও উদ্বিগ্ন। অবশেষে তিনি এলেন সন্ধ্যা রাতে। তাকে দেখে বাড়ির সকলে সাহসী ও আনন্দিত হয়ে উঠলাম। আমার বোনের বাড়ির উঠোন ভর্তি মানুষ। শিশু, কিশোর-কিশোরীসহ নানান বয়সের নরনারী। বাবা সকলের মাঝখানে গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রেডিওতে খবর প্রচার করবে। গুড়ের ওপর মাছি বসার মতো সবাই গোল হয়ে বসে আছে একটি ট্রানজিস্টরকে ঘিরে। যুদ্ধের খবর ও *চরমপত্র* শোনার জন্য অস্থির প্রতীক্ষায় সকলে।

এভাবে তিন দিন কেটে গেল। মায়ের কান্নাকাটির জন্য ভাইয়েরা মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারছেন না।

দুই দিন পর মাকে কাদিয়ে বাবা আমার বড় তিন ভাইকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিংয়ে পাঠালেন আগরতলা।

আমরা ছয় ভাই দুইবোন। আমি কনিষ্ঠের উচ্চতায় আসীন। সবচেয়ে বড় দুই ভাই ঢাকায়। একজন বেসরকারি চাকুরে, অন্যজন ইউনিভার্সিটির ছাত্র। যুদ্ধের শুরু থেকে আমরা যোগাযোগহীন ছিলাম। বড় বোন ছিলেন সংসারের চতুর্থ সন্তান। বিয়ের সূত্রে তিনি তখন স্বামীর সংসারে। ছয় ছয়টি সন্তানকে দৃষ্টির সীমানায় না পেয়ে মা তখন ভীষণ রকম ভেঙে পড়েন। চোখের নিচে কালি পড়ে চোয়াল ভেঙে হঠাৎ করেই মায়ের যেন বয়স বেড়ে গেল।

বাবার গহীনেও একই তোলপাড়। প্রকাশ্যে যুদ্ধের চেয়েও মনের ভেতর বাড়ির যুদ্ধে তিনি অহর্নিশ ক্লান্ত। কিন্তু কাউকে বুঝতে দেন না। উল্টো মাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাখেন।

তিন ভাই আগরতলা চলে যাবার দিন দুই পর বাবা জানালেন আজ গভীর রাতে আমরা নৌপথে আমাদের গ্রামের বাড়িতে রওনা হবো। মালামাল বলতে বড় একটি টিনের ট্রাংক, বাক্স যা আমাদের পরনের কাপড় দিয়ে ভরা আর মায়ের কোমরে গোজা তার গহনার পুটলি, ব্যস।

বুক ধড়ফড় করা ভয় ও টান টান উত্তেজনা নিয়ে আমরা গভীর রাতের উথাল-পাথাল প্রতীক্ষায়। একটি নির্ঘুম রাত একটি শিশুতোষ মনের ওপর যে কতোটা গভীর ছাপ রেখে যেতে পারে তার ভুক্তভোগী প্রমাণ আমি।

আজ বয়স আমার চল্লিশের সীমান্তের শুরুটা ছুয়েছে। এখনো পার হয়নি। তবুও এতোটা বছর পরেও কোনা কারণে যদি একটি ঘুমহীন রাত কাটানোর বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে আমার বুকের ভেতর সেই রাতের ভয়টি এসে আমাকে কাপাতে থাকে, আমি কাপতে থাকি। আমাকে দোলাতে থাকে, আমি দুলতে থাকি। ফলে সারা রাত নির্ঘুম থাকি।

বাড়ির সকলের কাছ থেকে চক্ষুসজল বিদায় নিয়ে কিছু দূর পায়ে হেটে আমরা একটি বিশাল ধানী নৌকায় চড়ে বসলাম। নৌকা বোঝাই ধানের বস্তা। নৌকা চলছে, অন্ধকারে আমরা চলছি। বৈঠার জলজশব্দ, ঝি ঝি পোকা, কোলা ব্যাঙ, মাছের ঘাই, দূরে গুলির আওয়াজ, সব কিছু মিলিয়ে আমাদের সকলের নির্ঘুম যাত্রা।

এতো ভয়ের মধ্যেও আমি এবং আমার পিঠেপিঠি বোন শিরিনআপা কি করে যেন ভোরের দিকে দণ্ড খানেকের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দূরে কোথাও মর্টারের শেল পতনের শব্দে হুড়মুড় করে উঠে বসলাম। এদিক–সেদিক তাকিয়ে দেখি নৌকার ভেতরে বাবা নেই। ভয়ে কেদে উঠতে গিয়ে দেখি তিনি আরো তিন মাঝির সঙ্গে নদীর পাড় দিয়ে পায়ে হেটে নৌকার গুন টেনে চলছেন। এভাবে বাবা প্রয়োজনে কখনো গুন টেনে, কখনো নৌকায় উঠে সামনের দিকে চারজন মাঝির একজন হয়ে দাড় বৈঠা বাইতেন। ছেড়া গেঞ্জি, হাটুর ওপর লুঙ্গি বেধে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে বাবা দিব্যি মাঝি হয়ে গিয়েছেন।

নৌকার বড় মাঝি যিনি পেছনে হাল বৈঠা ধরে বসে থাকেন আর সময়ে অসময়ে হাকডাক দিয়ে মাঝিদের নিয়ন্ত্রণ করেন, অধিকাংশ সময় আমি তার পাশেই বসে থাকতাম। পচা, গলা, ফুলে যাওয়া, কুকুর, কাক ও শকুনে খাওয়া, হাত নেই, মাথা নেই পাহীন বিচিত্র ধরনের মানুষের লাশ দেখতে দেখতে কেমন যেন বোবা বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে নদীর জলে চলতাম আর চোখের জলে ভাসতাম। বুক কাপানো ভয় নিয়ে একাকী ভাবতাম, এতো লাশের মধ্যে আমার কোনো ভাই নেই তো!

সকলের ভাবনাকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন মা। তার মুখের আদল তার ভয় ও শংকাকে ঢেকে রাখতে পারতো না। তিনি নৌকাতে তখন রীতিমতো কাজের বুয়া। আমরা চারজন ছাড়া নৌকার বড় মাঝিসহ তারা চারজন। মোট আটজন মানুষের রান্না মাকে একা সামলাতে হতো। মশলা বাটা থেকে শুরু করে তরিতরকারি, মাছ, পেয়াজ, কাটাকুটি সব কিছুই নিজ হাতে করতেন।

লাকড়ির চুলায় আগুন কমে এলে মাঝে মধ্যে আমি বা আমার বোন ফুকনিতে ফু দিয়ে উনুনের আগুনকে জোড়ালো করে দিতাম সাহায্য বলতে এটুকুই! মাকে দেখে কোনোভাবেই বোঝায় উপায় নেই যে, কয়েকদিন আগেও তিনি কি নিশ্চিন্ত, রাশভারী ও সম্ভ্রান্ত মুখশ্রীর মানুষ ছিলেন। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে চোখের নিচে কালি, স্নানহীন, উসকো–খুসকো চুল, মশলা বাটা, হলুদাভ হাত, পরনের ময়লা সুতি শাড়ি, শরীরে মাছ–মশলার মিশ্র গন্ধ, সব কিছু মিলিয়ে মা যেন এক দুঃখিনী মানুষের চিরচেনা ছবি হয়ে উঠলেন।

এভাবে চলতে চলতে দুই রাত দুই দিন পরে দুপুরবেলা পাকসেনাদের নির্দেশে তালতলা, কাঠপট্টি ঘাটে আমাদের নৌকা ভেড়াতে হলো। ইতিমধ্যে মা আমার বোনকে নিয়ে পাটাতনের নিচে চলে গেলেন। এখনো মনে আছে, বড় মাঝিকে জাপটে ধরে আমি কি ভীষণ কাপছিলাম।

ঘাটে দাড়িয়ে পাকিস্তানি সেনাদল। ভেতরে পাঠালো দুজন বাঙালি পুলিশ। নৌকায় কোনো আগ্নেয়াস্ত্র আছে কি না বা মুক্তিযোদ্ধা পারাপার করছে কি না ইত্যাদি প্রশ্ন। বেয়নেটের খোচায় খোচায় বস্তা থেকে ধান গড়িয়ে পড়ছে।

প্রতিটি বস্তা এভাবে পরখ করতে করতে এক সময় আমাদের ট্রাংক বাক্সটির সামনে এলো।

বাক্সটি খুলে দেখাতে বললে বাবা কোমর থেকে চাবি নিয়ে তালা খুললেন। দুজন পুলিশ। একজন খোলা বাক্সের কাপড়ের দিকে তাকিয়ে। তার পাশে বাবা দাড়িয়ে। অন্যজন একটু উপুড় হয়ে কাপড়গুলো নেড়ে–চেড়ে দেখছে। উদ্দেশ্য হয়তো কিছু পাওয়া যায় কি না। হঠাৎ করে কাপড় থেকে পেতলের একটি পদবী ফুল। যেটা বাবা ডিউটিরত অবস্থায় কাধে ব্যবহার করতেন। বাক্সের বাইরে এসে পাটাতনের ওপর গড়িয়ে পড়লো। আর শেষ রক্ষা হলো না বুঝি।

বাবা মাথা নিচু করে ঠায় দাড়িয়ে।

পাশে দাড়ানো পুলিশটি তীরের দিকে মুখ তুলে তাকালো সেনা অফিসারের উদ্দেশ্যে।

বাবা যেন কেপে উঠলেন।

অন্য পুলিশটি তার পায়ের বুট দিয়ে বাক্স থেকে বের হওয়া পদবি ফুলটি চাপ দিয়ে ধরলেন। বড় মাঝির একটি হাত তখন আমার কাধ খামছে ধরেছে।

অতোটুকু ছোট বয়সেও বুঝতে পারলাম আমাদের বুঝি আর শেষ রক্ষা হলো না।

এ দুই দিন কঠিন পথ চলতে চলতে জীবনে বেচে থাকার জন্য অনেক কিছুই যেন শিখে ফেলেছিলাম। আসন্ন ধ্বংসের ভয়ে ভীত হয়ে কেদে না ফেলে সাহসে বুক বেধে চুপ থাকলাম। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ঘটনা। কিন্তু ভীষণ তোলপাড় করা মুহূর্ত।

তীরে দাড়ানো সেনা অফিসার হেকে উঠলো, *কেয়া মিলা কুছ?*

এ কথা শুনে বাবার দুই কানের পেছন দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরে পড়তে লাগলো।

হঠাৎ বোমা ফাটানো চিৎকারে চেকিংরত পুলিশটি বলে উঠলো, সব কুছ ঠিক হ্যায় স্যার।

পরে বাবার মুখে শুনে কথাটির মানে বুঝেছিলাম। আমরা সকলেই যেন সেদিন *প্রথম মৃত্যুর আগে দ্বিতীয়বার জন্ম নিলাম।*

পুলিশ দুজন নৌকা ছেড়ে চলে যেতে যেতে নিচু স্বরে বলে গেলেন বাবাকে উদ্দেশ্য করে, স্যার আপনি ভাগ্যবান। আপনি এই শুয়োরের বাচ্চাদের হাত থেকে পালাতে পারছেন। দোয়া করুন, আমরাও যেনে পালাতে পারি। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারি।

প্রতিউত্তরে মাথা নিচু করে বাবাকে যেন কি বিড় বিড় করতে শুনলাম। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। মনে হয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কিছু বলেছিলেন। নিশ্চিত মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে অলৌকিকভাবে বেচে যাওয়ার আনন্দে কি না জানি না, বাবার মুখের শব্দগুলো স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল না।

তারপরের সময়টা মোটামুটি ঝামেলা বিহীন। চলে এলাম গ্রামের বাড়িতে। দেশও স্বাধীন হলো। একে একে সব ভাইয়েরা যুদ্ধ শেষে ঘরে ফিরলেন। বাবা আবার কাজে যোগ দিলেন সদ্য স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে। সেই দিনের সেই ফেরেশতাতুল্য দুজন পুলিশকে বাবা অনেক চেষ্টা করলেন খুজে পেতে, পেলেন না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খুজেছেন, পাননি।

বাবা চলে গেছেন ১৯৯১-র ১৩ জানুয়ারি। মা এখনো জীবিত, শয্যাশায়ী। সেই মানুষ দুটি এখনো আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিতে ভীষণ রকম তাজা। অমলিন। জানি না তারা কোথায় আছেন বা আদৌ আছেন কি না। তবে তাদের জন্য প্রার্থনা একটাই, তারা ও তাদের পরিবারের সকলেই যেন সর্বাবস্থায় মহান করুণাময় স্রষ্টার রহমতের সুশীতল ছায়ায় থাকার সুযোগ পান।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

সতর্ক মি. জোকার

- শাহরীন আজমি বর্ষা

মি. জোকারকে ঢাকায় মিটিং-এ যেতে হবে আজকালের মধ্যে। অফিসের কাজগুলো শেষ করতে কিছুটা রাত হয়ে গেল। **তবু তো দিনের বেলা রওনা হওয়া যাবে।**

সকালবেলা প্রস্তুত হতে গিয়ে টিভি ছেড়ে দিলেন মি. জোকার। নাশতা করছেন আর টিভির দিকে চোখ রেখেছেন। আসল খবরটা পেলেন টিভিতে। টিভি উপস্থাপক জানালেন আকাশের অবস্থা ভালো নয়। নদী ও সমুদ্র বন্দরকে সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। **আবহাওয়া অফিসের রিপোর্ট** ́ পাওয়াতে মি. জোকার বিকল্প পথের চিন্তা করতে লাগলেন। যদিও খরচ একটু বেশি, সময় বেশি লাগবে তবুও জল পথের দিকে তিনি গেলেন না। বিরূপ আবহাওয়া যে কারণ সেটা অফিস বুঝবে বলেই বিশ্বাস জোকারের।

অফিসের কলিগরা আলাপ করছিলেন নদী দুর্ঘটনার কথা। একই সঙ্গে দুশ্চিন্তা করছিলেন তাদের কলিগের জন্য।

সত্যি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করলেন জোকার। অফিসের কাজ শেষে ফেরার পালা। চলে গেলেন নৌ বন্দরের দিকে। আসামাত্র একটি লঞ্চে যেতে পারতেন। কিন্তু **অতিরিক্ত যাত্রী** দেখে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। দাড়িয়ে থেকে ভাবছিলেন দোষ কি শুধু নৌযান মালিকদের? সাধারণ মানুষ একটু সচেতন হলেই তো অতিরিক্ত যাত্রীদের কারণে নৌযান ডোবে না।

মি. জোকার যে নৌযানে উঠলেন তাতে তুলনামূলকভাবে কম যাত্রী। যানের মোটামুটি এক কোণের দিকে দাড়িয়ে আছেন। হঠাৎ খেয়াল করলেন পরনের কাপড়গুলো বিরক্তিকর। তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে তা পাল্টে ফেললেন। বাথরুমের ভেতর ঢুকলে বমি আসার জোগাড়। নৌযান দুর্ঘটনায় যদি পড়ে তাহলে **হালকা কাপড়গুলো সাতার কাটতে, উদ্ধার পেতে** সাহায্য করবে।

পাশের যাত্রীদের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন একজন ভদ্রমহিলা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে আছেন। একটা ছেলে সামান্য দূরে চলে গেছে। সম্ভবত মা তা খেয়াল করছেন না। এখন কিছু ঘটলে নিশ্চয় মা তাদের বাচ্চাদের রক্ষা করতে সমস্যায় পড়বেন।

নিজের সন্তানরা সঙ্গে না থাকায় পরের **সন্তানকে কাছাকাছি রাখার জন্য** ছেলেটাকে কাছে ডাকলেন মি. জোকার। গল্প করতে করতে সময় পার হয়ে যাচ্ছিল।

অপর একটা ঘাটে যাত্রী ওঠানামা করার সুযোগে মি. জোকার ছেলেটার জন্য **দুইটা বেলুন** কিনে নিয়ে এলেন।

গল্প করতে করতে আর খেলতে খেলতে মি. জোকার বাড়ি পৌছে গেলেন।

বাড়ি এসে মি. জোকার ভাবছিলেন, যাক, আজ বেচে গেলাম। কিন্তু কতোদিন এভাবে বাচবো? একদিকে নৌযান মালিকদের ত্রুটিপূর্ণ নৌযান, অপরদিকে জনগণের সচেতনতার অভাব। সরকারের কথা না–ইবা বললাম!

এই জলপথে দুর্ঘটনা ঘটলে জলপরী (মন্ত্রী) পাবলিক সেন্টিমেন্টের কথা চিন্তা করেন। বড়জোর একটা ছাগল দান করবেন। এই তো দেশের অবস্থা! ধন্য নৌযান মালিকরা, ধন্য আমাদের সরকার, ধন্য আমরা জনগণ।

রাজশাহী থেকে

নোংরামি

- নাসিম

ব্যবসার কারণে প্রতি সপ্তাহে দুই একবার ঢাকা যেতেই হয়। আর আমাদের যাওয়ার জন্য প্রধান মাধ্যম নৌপথ। লঞ্চ দিয়ে যাতায়াতের কারণে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার আছে।

তবে বিরক্তিকর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

মাঝে মধ্যে পাজামা ,পাঞ্জাবি ও টুপি পরা এক হুজুর লঞ্চে আসেন। তিনি নামাজে আসার জন্য চিৎকার–চেচামেচি করতেন। নামাজের নির্ধারিত স্থান থাকলেও সে জায়গা রেখে তিনি লঞ্চের মাঝামাঝি সবাইকে সরিয়ে নামাজের জায়গা করতেন।

তার উচ্চ কণ্ঠে শোনা যেতো, এখনই জামায়াত হবে। এখানেই হবে।

ভোর রাতে যখন ফজরের আজান হয় ঠিক তখন তার চিৎকার–চেচামেচি শুরু হতো। অনেক হিন্দু যাত্রীদেরও তিনি গা ধরে ডেকে ওঠাতেন। এবং নির্ধারিত নামাজের স্থান থাকা সত্ত্বেও ঘুম থেকে জাগিয়ে নামাজ পড়ার জায়গা তৈরি করে নিতেন।

অনেকেই আমার মতো বিরক্তি বোধ করতেন। হুজুর সেজে তিনি সবাইকে নামাজে ডাকতেন।

কিন্তু তার পাজামা–পাঞ্জাবির আড়ালে ছিল নোংরামি।

তিনি কখনোই পুরুষদের সঙ্গে ঘুমাতেন না। লঞ্চে তার বিছানা হতো পেছনে যেখানে মহিলাদের বিছানা হয়ে থাকে। রাতের নির্জনতার সুযোগে তিনি মহিলাদের গায়ে হাত চালাতেন।

কথায় আছে *দশ দিন চোরের এক দিন গেরস্তের*। দুর্ভাগা হুজুর একদিন *কোকো* লঞ্চে অপকর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন।

তার নোংরামি প্রকাশ পেয়ে গেল। ভদ্রতা ও ধর্মকে সামনে রেখে তার অপকর্ম চালানো ধরা খেয়ে গেল।

এখন লঞ্চে হুজুরকে তেমন একটা দেখা যায় না। তবে প্রকৃত মুসলমানরা ঠিকই নির্ধারিত স্থানে গিয়ে নামাজ আদায় করে। হিন্দুভাইয়েরা ঘুমায় নাক ডেকে। নিরাপদে থাকে আমাদের মা ও বোনেরা।

ওয়েস্টার্ন পাড়া, ভোলা থেকে

অন্য জাতের মানুষ

- আবুল খায়ের মোস্তফা

তখন আমার পোস্টিং ঝালকাঠি জেলায়। কথা বলে, ধান–নদী–খাল, এই তিনে বরিশাল। বৃহত্তর বরিশাল জেলার একটা মহকুমা ছিল ঝালকাঠি। বর্তমানে জেলা। সত্যিই তাই। নদী বহুল এলাকা। যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম নদীপথ। অর্থাৎ নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ এবং রকেট।

সাজানো–গোছানো, পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ছোট শহর ঝালকাঠি। বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করছিলাম। শুধু যাতায়াতের এতো দিনকার ধরন পাল্টে গেল। লঞ্চের নির্ধারিত সময়ের আগেই লঞ্চঘাটে অপেক্ষা। তারপর কাঙ্ক্ষিত লঞ্চ ঘাটে ভিড়লে হুড়হুড় করে লঞ্চে আরোহণ, অতঃপর উন্মুক্ত প্রকৃতি অবলোকন করতে করতে দীর্ঘ প্রতিক্ষা। প্রথম কিছুটা বোরিং ফিল করলেও এক পর্যায়ে এ ভ্রমণই আনন্দময় হয়ে উঠলো মনের অজান্তে।

প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা। সে সুবাদে অফিশিয়াল যে কোনো ভ্রমণে যানবাহনে প্রথম শ্রেণীর সুবিধা প্রাপ্ত ছিলাম। রকেটে ভ্রমণ করলে আর্থিক সুবিধা বেশি থাকায় অফিশিয়াল ভ্রমণগুলো রকেটের প্রথম শ্রেণীতেই করতাম।

যতোদূর মনে পড়ে, সময়টা ১৯৯৫ সালের মার্চ মাস। অফিশিয়াল কাজ শেষে ঢাকা থেকে ফিরছিলাম। যথানিয়মে রকেটের প্রথম শ্রেণী। রিজার্ভেশনটা আগেই করা ছিল। রকেট ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে তড়িঘড়ি করে আমার নির্ধারিত ক্যাবিনে গিয়ে উঠলাম। জামা–প্যান্ট–টাই ছেড়ে একটা ট্রাউজার্স পরলাম। তারপর হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম এবং বিছানায় কিছুক্ষণের জন্য শরীরটাকে এলিয়ে দিলাম। সারা দিনের ক্লান্ত শরীরটা যখন বেশ স্বাচ্ছন্দ হয়ে এলো তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। ততোক্ষণে রকেট ঢাকা থেকে অনেক দূরত্বের ব্যবধানে প্রশস্ত নদী গর্ভে তার বিশাল আকৃতির পাখা ঝাপটিয়ে রাজহাসের মতো দুলতে দুলতে বহমান।

খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। তাই দেরি না করে রাতের খাবারের জন্য পা বাড়ালাম। ক্যাবিন থেকে বের হতেই চোখে পড়লো পাশের ক্যাবিনের খোলা দরজা। দুই পা এগোতে দেখি সে ক্যাবিনে দুইজন বিদেশিনী। একজন মধ্য বয়সী, অন্যজন সদ্য যুবতী অর্থাৎ বালিকা, বেশ উৎফুল্ল। কিচির মিচির করে গল্পে মশগুল। মন স্থির করলাম, খাবার শেষে এসে ওদের সঙ্গে পরিচিত হবো। বেশ ভালোই কাটবে ভ্রমণের একঘেয়েমি রাত। ওদের দেশ সম্পর্কেও জানা যাবে অনেক কিছু।

ততোক্ষণে লক্ষ্য করলাম অল্প বয়সী মেয়েটাও আমার দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। একবার চার চোখের মিলনও ঘটে গেল। আগ্রহটা আরো তীব্রতর হলো।

আনুমানিক রাত সাড়ে নয়টা। অনুমতি নিয়ে তাদের ক্যাবিনে প্রবেশ করলাম। নিজের পরিচয় দিলাম। তারপর তাদের বিস্তারিত পরিচয় নিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ জমে উঠলো আমাদের আলাপচারিতা। খুব সহজে তারা আমাকে আপন করে নিল। উপযাচক হয়ে পরিচিত হতে গিয়ে বিরক্ত হয় কি না মর্মে যে ভয় পাচ্ছিলাম, বাস্তবে পেলাম এর বিপরীত। তারা এতোই আনন্দিত হলো যে, তা ভাষার আদলে প্রকাশ করা দুরূহ।

বিদেশিনী দুজন মা ও মেয়ে। জাপানের অধিবাসী। রাজধানী টোকিওতে ওদের নিজস্ব বাড়ি। মা কলেজের শিক্ষিক। মেয়ে ক্লাস নাইনের ছাত্রী। এই প্রথম বাংলাদেশ ভ্রমণে এসেছে। গন্তব্য বরিশাল।

মা মোটামুটি ইংরেজি বলতে পারলেও মেয়েটা তেমন বলতে পারে না। তবুও আধো আধো ইংরেজি এবং ভাবে-ইঙ্গিতে, অঙ্গ-ভঙ্গিমাতে সে তার ভাব প্রকাশে নিবেদিত ছিল।

কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জানলাম, বরিশালের এক প্রতিবন্ধী ছেলে টোকিওতে অনুষ্ঠিত প্রতিবন্ধী ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। ওই প্রতিবন্ধী ছেলেটার সঙ্গে এই মেয়েটার পরিচয় ঘটে। তারপর বন্ধুত্ব। সেই প্রতিবন্ধী ছেলেটার আহ্বানে মেয়েকে নিয়ে মাও এসেছে বেড়াতে। দুই তিন দিন বরিশাল বেড়িয়ে ঢাকা ফিরবে। তারপর বাংলাদেশের যতোটুকু অঞ্চল সম্ভব ঘুরে দেখবে। এরপর ফিরে যাবে নিজ দেশে।

বিদেশিনীরা সঙ্গে নিয়ে এসেছে পর্যাপ্ত ফল-ফলাদি। রাতে তারা ঝাল জাতীয় কোনো খাবার খাবে না। তারা একের পর এক ফল খাচ্ছে। বলাবাহুল্য, আমাকেও খেতে হচ্ছে। কোনো নিষেধ মানছে না। জোর করে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে।

আমি লক্ষ্য করলাম, তারা ফল খেয়ে খোসাগুলো তাদের বহু পকেটওয়ালা বৃহৎ আকৃতির ব্যাগের একটা পকেটে পুরে রাখছে। এর হেতুটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন এমনটা করছো?

জবাবে তারা অবাক হয়ে বললো, রকেটে তো কোনো ডাস্টবিন দেখছি না, তবে ফেলবো কোথায়? তাই রেখে দিচ্ছি আগামী কাল বরিশাল নেমে ফেলে দেবো।

বললাম, নদীতে ফেলে দিলেই তো হয়।

জবাবে আরো অবাক হয়ে তারা বললো, এতে নদীর পানি দূষিত হবে যে!

ততোধিক অবাক হয়ে অনুধাবন করলাম এরা কতো উন্নত, কতো উন্নত এদের মনমানসিকতা, কতোটা সভ্য! তাদের কথার কোনো জবাব ইচ্ছে করেই দিলাম না। মনে মনে বললাম, এটা বাংলাদেশের নদী, এতো সহজে এখানকার পানি দূষিত হয় কি করে!

রাত এগারোটা প্রায়। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হেসে দুই তিনবার এক্সকিউজ বলে মা জানালেন, তার খুব ক্লান্তি লাগছে, একটু ঘুমাতে চায়। মেয়েটাকে বললো, চু, তুমি ইচ্ছে করলে ভদ্রলোকের ক্যাবিনে গিয়ে গল্প করতে পারো।

মেয়েটা উৎসাহের সঙ্গে সম্মত হয়ে আমার ক্যাবিনে চলে এলো।

মেয়েটার নাম চিয়াং চু। সংক্ষেপে চু বলে ডাকে সবাই। তাই আমিও তাকে চু বলে ডাকতে শুরু করেছি ইতিমধ্যে। চু-এর সঙ্গে রাত প্রায় দুটা পর্যন্ত গল্প করলাম। শিল্পীর নিপুণ হাতে আকা ছবির মতো চু। এতো সুন্দর মানবী আগে কখনো দেখিনি। যেন মানুষ নয়, অপরূপা এক পরী। ধবধবে ফরশা। অপূর্ব চেহারা। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ তার কমনীয় ত্বক। শারীরিক এতো সৌন্দর্য ছাপিয়ে আমার অন্তর্দৃষ্টিতে তাদের মনের সৌন্দর্যই বেশি মোহময় হয়ে উঠছিল।

কতো নিশ্চিন্তে, কতো বিশ্বাসে মা তার সদ্য যৌবনা ফুলের মতো মেয়েকে এক ক্ষণিক পরিচিত বিদেশি যুবকের সঙ্গে একাকী গল্প করার অনুমতি দিলেন। প্রচণ্ড মুগ্ধ হলাম তাদের এই বিশ্বাসকে স্মরণ করে। তাদের

বৃহৎ হৃদয়ের, বৃহত্তর মহত্বের কথা ভেবে আবারও অবাক হলাম। অবাক হলাম এই ভেবে যে, একটা দরিদ্রতম দেশের একজন প্রতিবন্ধীকে তারা বন্ধু ভেবে, সে বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে আসতে পারে।

রাত দুইটার দিকে চু বিদায় নিল। আমি আমার ক্যাবিনে চু-এর সঙ্গে কাটানো তিনটি ঘণ্টার অবিমিশ্র আনন্দঘন স্মৃতি নিয়ে বাকি রাতটুকু কাটালাম। কোনো মতেই ঘুম এলো না।

ভোর ছয়টার দিকে বরিশাল ঘাট ধরলো। বিদায় অভিবাদন জানিয়ে চু তার মায়ের সঙ্গে রকেট থেকে নেমে গেল।

তাকিয়ে রইলাম যতোদূর দেখা যায়। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু অদৃশ্য হলো না তাদের ফেলে যাওয়া স্মৃতি। আজো ভেসে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে মনের বিশাল ক্যানভাসে। তখন কেবলই ভাবি, এরা অন্য জাতের মানুষ।

খুলনা থেকে

বাসনা পূরণ

- অনামিকা বসু

আমার স্বামী দীর্ঘ দুই বছর প্রবাস জীবনের পর দেশে ফিরেছেন। ভদ্রলোক পিতামাতার একমাত্র ছেলে হওয়াতে তার মা–বোনদের নজরদারিতে আমার উপস্থিতি হয়ে পড়ে নগন্য। শুধু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ছাড়া দেখা হয় না। বাড়ি ভর্তি মানুষ। তিনি যদি বা রান্না ঘরে উকি দেন তো মা–বোন ঘেমে যান। আমাদের দুই বাচ্চা তাদের আবদার করে। তাদেরকে নিয়ে বেড়াতে যায়। আমি শুধু নীরবে দেখি আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি, কিছুই বলি না।

স্বামী ভদ্রলোক যে বোঝেননি তা নয়। তিনিও প্রচণ্ড রেগে আছেন। আমার কোনো চাওয়া–পাওয়া নেই। কোনো অভিযোগ–আবদার নেই। সে জন্য তিনি ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছেন। মাঝে মধ্যে শুধু বলেন, এনি প্রবলেম?

মাথা নাড়িয়ে না সূচক জবাব দিই। দীর্ঘ চল্লিশ দিন এভাবে পার হলো। এবার তার চলে যাবার পালা। রাতে বললেন, আগামী দিন এমবাসিতে যেতে হবে তোমাকে নিয়ে।

খুশিতে কিছুই বলতে পারছি না। আনন্দে নাচতে ইচ্ছা হচ্ছে। বহু দিন পর তার সঙ্গে ঘুরতে বের হবো।

সকালে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। বাসা থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবে?

বললাম, তোমার যেখানে খুশি।

জবাবে ভদ্রলোক খুশি হতে পারেননি। শুধু বললেন, আজ যেখানে যেতে চাও নিয়ে যাবো।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ফ্যান্টাসি কিংডমে।

আড়চোখে তাকিয়ে ডাকলেন ট্যাকসি ক্যাব। ফ্যান্টাসি কিংডমে গেলাম। ঘুরলেন ঠিকই কিন্তু কোনো আইটেমে চড়ালেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন, বাসার এই পরিস্থিতিতে কি কথা বলা যায়!

বললাম, এখন বলো। রেগে বেরিয়ে এলেন এবং ফিরে আসতে আসতে বললেন, ফ্যান্টাসি কিংডমের চেয়ে হোটেলে উঠলে ভালো হতো না?

বললাম, দিনে কি কেউ হোটেলে থাকে?

তোমার মতো যারা তারা বাড়িতেই থাকে।

বেশ।

রাস্তায় আর কোনো কথা হলো না। আশুলিয়া এসে মনটা ভালো হয়ে গেল। বললাম, নৌকায় চড়বো।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নৌকায় চড়ালেন।

খুব ভালো লাগছে।

বললাম, তুমি আমার কোলে শুয়ে থাকো। তবে মাঝিকে বলো কিছু দিয়ে আড়াল করতে।

মাঝি একটি চাদর দিয়ে আমাদের আড়াল করলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আদিম বাসনায় লিপ্ত হতে চাইলেন।

বললাম, এখানে কি সম্ভব?

স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে সবখানেই সম্ভব।

মাঝিকে দূরে একটি গাছে নৌকা বাধতে বললেন।

ততোক্ষণে আমার কামিজটি উধাও। সমস্ত শরীরে গুণে গুণে পঞ্চাশটি চুমুর কালো দাগ একে দিলেন। বললেন, দুই বছরের জন্য একে দিয়ে গেলাম।

তারপরও নিস্তার নেই। এবার শুরু হলো আরো গভীরে যাবার পালা। পুরোপুরি আদিম বাসনা পূরণ করতে পারলেন না। সে কাজটি মুখ দিয়ে করলেন। আমি প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে মুখ দিয়ে শব্দ করতে লাগলাম।

মাঝি নৌকার ছাদে বসেই সব টের পেল।

এক সময়ে আমাদের ভ্রমণ বাসনা পূর্ণ হলো। নৌকা ভ্রমণে যে এতো সুখ তা প্রথম ভ্রমণেই বুঝলাম।

এবার ফেরার পালা।

মাঝি নৌকা তীরে ভিড়িয়ে দাম হেকে বসলো। ঘন্টা পঞ্চাশ টাকায় ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু মাঝি দাবি করলো তিন ঘন্টায় ছয়শ টাকা। সে বললো, নাহলে আপনারা যা করেছেন তা সবাইকে বলবো।

স্বামী ভদ্রলোক রেগে বললেন, আমার বৌ, আমি যা খুশি তাই করবো তোর কি ব্যাটা?

মাঝি বললেন, *বুইড়া কাইল্যা বেটার সুন্দর এটুকু মাইয়া বৌ, আমাগো শিখায়েন না। এ রকম বহুত আছে।*

মাঝিকে মারতে উদ্যত হলে বাধা দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, দুইশ টাকা দিয়ে দাও।

মাঝি দুইশ টাকাও নিল না। মানুষ জড়ো করলো। ভীষণ লজ্জা পেলাম। সবাই আমাকে দেখছে।

বাধ্য হয়ে বললাম, দেখুন, আমার স্বামী বাইরে থাকেন। কাল চলে যাবেন বলে আজ আমরা বেড়াতে এসেছি। কিন্তু মাঝি এখন ব্ল্যাকমেইল করছে।

এ কথা শুনে সবাই বকা দিয়ে মাঝিকে টাকা নিতে বললো। তবে সেই সঙ্গে কিছু উক্তি তারা জুড়ে দিল, *এ রকম বৌ পেলে কি কারো বাসা আর নৌকা মনে থাকে।*

তারপর কখনোই আর নৌকা ভ্রমণ করিনি।

গোপীবাগ, ঢাকা থেকে

কাডা না আকাডা

– এমএইচ রশীদ ঝিলন

আমি একজন ব্যবসায়ী। সেই হিসেবে মাঝে মধ্যে নৌপথ ভ্রমণ করতে হয়। বিভিন্ন সময় লঞ্চে যাতায়াতে কিছু ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। নৌপথ এমনি একটা ভ্রমণ যেখানে বিভিন্ন রকমের মানুষের সমাগম ঘটে। অনেক চেনা-অচেনা লোকদের সঙ্গে দেখা হয়। আমার নিজ চোখে দেখা ঘটনার বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করছি।

লঞ্চে তো হকার, ফেরিওয়ালাদের রাজত্ব। তারা যা ইচ্ছা তা-ই করে বেড়ায়। তাদের হাকডাকে কান জ্বালা-পালা। তবুও আমাদের সাধারণ যাত্রীদের নীরবে সব সহ্য করতে হয়। এর মধ্যে অনেকে মজা নিয়ে নেয়।

আমরা ব্যবসায়ী হওয়াতে আমাদের জায়গা আলাদা। এক পাশে রশি দিয়ে ঘেরাও করা থাকে। তারপরেও কেউ ভুলে এসে আমাদের জায়গায় এসে বিছানা করে থাকে। লঞ্চ যখন চলে তখন আরেক চিত্র। শো শো বাতাসের শব্দ। তবে লঞ্চে রাতের চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। সবাই সারিবদ্ধ হয়ে ঘুমায়, লঞ্চ কোন ঘাটে এলে আবার ফেরিওয়ালা, হকারদের উৎপাত-চিৎকার শুরু হয়।

লঞ্চে তাবলীগ জামায়াত–এর লোক প্রায়ই থাকেন। হয়তো একজন আওয়াজ দিল, এখনই জামায়াত আরম্ভ হবে। হয়তো মুসল্লিরা জামায়াত করে নামাজ পড়ছে। যদিও কিছু লোকদের সাময়িক অসুবিধা হচ্ছে। নামাজ শেষ হওয়ার পর পরই আবার সগরম, হই চই শুরু হয়ে যায়।

লঞ্চে টিভি আছে। কেউ বলছে টিভি ছাড়েন। ইতিমধ্যে টিভি চলছে, কিছু লোক টিভি দেখছে। টিভির কাছাকাছি লোক ঘুমাচ্ছে। কেউ একজন চিৎকার করে বলছে, টিভি দেখে কে। এখন সবাই ঘুমায়। টিভি বন্ধ করেন।

লঞ্চের এক কোণায় চার পাচজন মিলে তাশ খেলছে আর বিড়ি খাচ্ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে, এতো রাতেও হকার বলছে, রুটি–কলা, নারকেল, চিড়া। আবার অদূরে দেখলাম, এক জায়গায় ঘুমানো নিয়ে হই চই একজন নাকি পা দিয়ে লাথি দিয়েছে তার মাথায় এই নিয়ে তর্ক হচ্ছে।

ইতিমধ্যে টিকেট মাস্টার এসে গেছেন। টিকেট দেয়া শুরু করেছেন। কেউ টিকেট নিচ্ছেন, কেউ বলছেন সকালে করবো। টিকেট মাস্টার খুব হাক ডাক দিয়ে বলছেন, *টিকেট কাটেন, টিকেট লন, কেউ আকাডা থাকয়েন না, ওই মিয়ারা... ।*

দেখলাম টিকেট মাস্টার একটু রসিকতায় বিভিন্ন রকম কথা বলছেন, তো এক ভাইকে টিকেট মাস্টার এভাবে বলছেন, ওই ভাই, আপনি *কাডা না আকাডা* (টিকেট কেটেছেন কি না)।

সেই ভাই দেখলাম খুবই রেগে গেলেন। বললেন, আমি মুসলমান, আমি হিন্দু নই। আপনি আমাকে *আকাডা* বলছেন কেন?

এক পর্যায়ে মাস্টার ও যাত্রীর কথা কাটাকাটি আরম্ভ হলো। লোকজন ঘুম থেকে উঠে গেল। মাস্টার যতোই ওই ভাইকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। টিকেট মাস্টার বলছেন, আপনাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয়, আমি দুষ্টামি করে বলেছি।

ওই লোক মানতে নারাজ।

পরে অবশ্য আমাদের হস্তক্ষেপে সমাঝোতা হলো।

যারা রসিকতা বোঝে না তাদের সঙ্গে কৌতুক না করাই ভালো। এটাও সত্যি যে, নৌপথে লঞ্চের স্টাফদের ব্যবহার ভালো নয়।

ভোলা সদর থেকে

অন্তিম ভ্রমণ

– মোহাম্মদ আবদুর রহিম

আমি তখন ময়মনসিংহে রেলওয়ের অ্যাসিস্টান্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এইএন)। থাকি স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে কেওয়াটখালি রেলওয়ে বাংলোতে। মেয়ে লাকী চার বছর ও ছেলে রুবেল এক বছর। বাংলোগুলো বৃটিশ আমলে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে তৈরি। এলাকাটি ছিমছাম, সুন্দর ও পরিপাটি করে সাজানো। বাংলোর সামনে বেশ বড় একটি ফুলের বাগান। পরিবেশ চমৎকার।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালের সেই কালো রাতে বাঙালি জাতির মুক্তির আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে পাকবাহিনী বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করে বহু লোক হতাহত করে। কিন্তু ১৭ এপৃল পর্যন্ত ময়মনসিংহ ছিল স্বাধীন।

যতোদূর মনে পড়ে বিমান আক্রমণের পর ১৮ এপৃল পাকবাহিনী ময়মনসিংহের দখল নেয়। জনসাধারণ যে যেদিকে পারলো ছুটলো। আমরাও ছুটলাম। গেলাম সোহাগী, আমার বাবুর্চি মনিরের শ্বশুরবাড়ি। সেখান থেকে আর্মির তাড়া খেয়ে শ্যামগঞ্জ রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টার। তারপর নিকটবর্তী কাজলা গ্রাম, এক দারোগার বাড়ি। তার পিতা অত্যন্ত দয়ালু ও ভালো লোক।

একদিন ভোরে আল্লাহর নাম ও ভদ্রলোকের দোয়া নিয়ে রওনা দিলাম অজানা পথে। সঙ্গে মুন্সিগঞ্জের গাজী মাহবুবুর রহমান। তিনি বর্তমানে বিজেএমসি-র জেনারেল ম্যানেজারের পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত। নয় মাইল হাটার পর গৌরিপুর এলাম। চার বছরের ছোট মেয়ে লাকীও নয় মাইল হেটেছিল। এখানে রিকশা পেলাম। হাটা ও রিকশায় দুই দিন চলার পর গফরগাওয়ের সন্নিকটস্থ হোসেনপুরের কাছে সন্ধ্যায় পৌছালাম। এখানেই এক ইঞ্জিনচালিত নৌকায় চড়ে বসলাম। নৌকাটি মাঝারি সাইজের, বাশের ছই। নৌকা ভর্তি যাত্রী।

আল্লাহর নাম নিয়ে মাঝি নৌকা ছাড়লো। নীরব নিস্তব্ধ রাত। আশপাশে কোনো নৌকা বা অন্য কোনো নৌযানের চলাচল নেই বললেই চলে। দূরে গ্রামগুলো দেখা যায় যেন শিল্পীর আকা ছবি। এতো ক্লান্তি, বেদনা, কষ্ট ও ভয়ের মাঝেও গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি। কখন যে এক ফোটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়লো টের পাইনি। আমার কোলের মেয়েটির গায়ে ফোটা পড়তেই সে আতকে উঠলো। এমনি পাখি ডাকা, ছায়া ঢাকা দেশটির ওপরই চলছে পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ। শিল্পীর আকা ছবিতে কে যেন লাল রঙ ছিটিয়ে দিচ্ছে। কবে হবে এই অন্যায়-অত্যাচারের শেষ? আমাদের কি হবে? হঠাৎ বৃষ্টিতে রেশ কেটে গেল। লাকী ও রুবেল ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। বৃষ্টির ফোটা তাদের গায়ে পড়ছে দেখে ছাতা ধরলাম।

নৌকা একই গতিতে চলছে। এক সময় বৃষ্টি থামলো। যতোই ঢাকার নিকটবর্তী হচ্ছি ততোই ভয় বাড়ছে, না জানি কখন গানবোট এসে আমাদের ধরে নেয়। চলতে চলতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি জানি না। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে জেগে দেখি কোনো এক বাজারের ঘাটে নৌকা ভিড়েছে, লোকজন নামছে। ঘাটটি ডেমরার কাছাকাছি হবে।

আমরাও দ্রুত নামার প্রস্তুতি নিলাম। দল ছাড়া হওয়া যাবে না। নামতে গিয়ে দেখি নৌকা খাড়া পাড়ের সঙ্গে ভেড়ানো। ঘাটটি নদী ভাঙা অংশে অবস্থিত। একটি কাঠ নৌকা থেকে পাড় পর্যন্ত বিছানো। ধরার জন্য একটি বাশ লাগানো আছে। এ ব্যবস্থায় নামা বিপজ্জনক। কিন্তু উপায় নেই। অন্যান্য যাত্রীরা নেমে গেছে। রুবেলকে কোলে নিয়ে গাজী সামনে, তার পেছনেই লাকীকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। স্ত্রী ফিরোজাকে পরে পার করবো। কিন্তু সেও পেছনে পেছনে আসতে লাগলো।

বৃষ্টি ভেজা কাঠটি পিচ্ছিল। কাঠের মাঝমাঝি আসতেই দেখি ফিরোজা কাপছে।

বললাম, ভয় পাচ্ছো ফিরোজা? সাবধানে পা ফেলো।

তখনই ঘটে গেল আমার জীবনের মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনাটি।

ফিরোজা পা পিছলে নদীতে পড়ে গেল। গলা পানিতে দাড়িয়ে ফিরোজা বলছে, আমাকে ধরো, স্রোতের টানে দাড়াতে পারছি না।

লাকীকে পাড়ে রেখে জুতা খুলে নদীতে ঝাপ দিলাম। দেখি ফিরোজা সেখানে নেই, ইতিমধ্যে স্রোতের টানে তলিয়ে গেছে। অনেক খোজাখুজি করেও তাকে পাওয়া গেল না। অভিমান করে কোথায় যেন লুকিয়ে রইলো।

পরদিন ভোরবেলা কিছু দূরেই লাশ পাওয়া গেল। ফিরোজা লাশ হয়ে ফিরে এলো। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার মুখে ব্যঙ্গহাসি। যেন পরিহাস করে বলছে, তুমি নাকি সাতারে পুরস্কার পেতে? খুব তো পৌরুষ ফলাতে, কোথায় গেল তোমার পৌরুষ? যে নিজের স্ত্রীকে উদ্ধার করতে পারে না তার আবার পৌরুষের বড়াই।

চেয়ে থাকতে থাকতে কখন যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছি জানি না, কতোক্ষণ যে সংজ্ঞাহীন ছিলাম তাও জানি না। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখি আমার লাকী, রুবেল আমার বুকে মাথা রেখে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাদছে। আমাকে চেতনা দেখে আমার চার বছরের মেয়ে লাকী বলছে, আব্বু, তুমি ওঠো, আম্মু তো গেল, তুমিও যদি চলে যাও আমরা যাবো কোথায়, আমাদের কি হবে?

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। আমার ছেলেমেয়েদের কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। তারা আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমি? সেই ব্যর্থতার গ্লানি ও অপরাধ বোধ নিয়ে বেচে আছি। মনে হয় ফিরোজা যেন আমার পাশে পাশেই আছে, আমি তার শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। সে যেন কেদে কেদে বলছে, কেন তুমি আমাকে ধরলে না? কেন তুমি আমাকে বাচতে দিলে না? তুমি একজন কাপুরুষ।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

দশ মিনিট

খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনি কেমন আছেন? আপনাকে একটিবার দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়ি মাঝে মধ্যে। একাই আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলি। অথচ ফোন নাম্বার জানা থাকা সত্ত্বেও আপনাকে ফোন করার সাহস আমার হয়ে ওঠে না। পহেলা বৈশাখে প্রথম আপনাকে দেখেছিলাম। কি যে ভালো লেগেছিল! সেই থেকে শুরু। সেদিন দূর থেকে অনেকবার আপনাকে দেখেছি, কাছে যাবার সাহস হয়নি যদি আমার ইমোশনটা প্রকাশ পায় সেই ভয়ে। দুই চোখ ভরে শুধু আপনাকেই দেখেছি। কি সুন্দর আপনি! বিশেষ করে আপনার চুল। সারা মাথা ভরা শাদা চুলে কালোর রেখা। সত্যিই খুব সুন্দর লাগে আপনাকে। ভাবছি মানুষ এতো সুন্দর হয় কি করে! লম্বা-চওড়া, এক কথায় আমার মনে ঢেউ খেলানো এক অপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টিকারী। হ্যা, আপনাকে আমার ভালো লেগেছে, খুব বেশি ভালো লেগেছে। ষাটউর্ধ এই আপনাকে কি করে বলি, আমি প্রেমে পড়েছি। আমাকে একদিন দশ মিনিট সময় দেবেন? আমি শুধু আপনাকে দুচোখ ভরে দেখবো।

আমি খুব ব্যস্ত। প্রতিদিন ব্যবসার কাজে বায়ারদের নিয়ে নানান কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। এ সপ্তাহে হবে না। তাছাড়া সামনের সপ্তাহে দেশের বাইরে যেতে হবে। একদম সময় নেই। আপনি বরং পরে যোগাযোগ করুন।

আমি অপেক্ষা করবো। যেদিন আপনার সময় হবে সেদিনই। হোক দেরি, মাস কিংবা বছর।

আপনি তো দেখছি নাছোড়বান্দা।

হ্যা ঠিক তাই।

আচ্ছা, এখন আসতে পারবেন?

হ্যা, পারবো। কোথায় বলুন। আমি আসবো।

বলছি, মনে রাখবেন দশ মিনিট। অফিসে আমার একটা মিটিংয়ে অ্যাটেন্ড করতে হবে।

ধন্যবাদ, আমি আসছি।

উফ, কি যে ভালো লাগছে আমার। যাকে দেখার জন্য এতোদিন স্বপ্নের জাল বুনেছি, একটু পরেই তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। লাফিয়ে উঠলাম। আলমারি খুলে আমার প্রিয় গোলাপি রংয়ের শাড়ি বের করলাম। আজ আমি মন ভরে সাজবো। শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে কপালে টিপ, চোখে কাজল, ঠোটে লিপস্টিক পরলাম। হাতে-কানে-গলায় পরলাম রূপার গহনা। নিজেকে আয়নার দেখে নিলাম। কেমন লাগছে আমাকে! না আর দেরি নয়, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। হাতের কাছেই পেয়ে গেলাম একটা হলুদ ক্যাব। খুব অল্প সময়েই পৌছে গেলাম তুরাগ নদীর পারে। ওই তো তাকে দেখা যাচ্ছে আকাশি নীল শার্ট পরে দাড়িয়ে। আজো তাকে সেদিনের মতো অপূর্ব লাগছে।

আমরা দুজন স্পিডবোটে উঠলাম। আমরা বসে আছি একজন আরেকজনের বিপরীতে।

স্পিডবোটটি চলছে তুরাগ নদী হয়ে শীতলক্ষ্যার বুকে। নদীর দুই পাশের কোনো সৌন্দর্যই আমার চোখে পড়ছে না। আমার চোখে শুধু কাছের এই মানুষটি। নদীর বুকে এসে যাকে আজ আমার খুব আপন মনে হচ্ছে, যাকে দেখার জন্য সময় পেয়েছি মাত্র দশ মিনিট। এই দশ মিনিট মন ভরে শুধু তাকেই দেখবো।

আমি তাকিয়ে আছি তার পানে। দুজনের কারো মুখে কোনো কথা নেই। আমার মন একে চলেছে শুধু তার ছবি। কি সুন্দর মুখ, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। চোখ দুটো একটু কটা। ভারী মিষ্টি চেহারা। বিধাতা খুব যত্ন করে তাকে বানিয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

শান্ত নদী হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠলো। বড় বড় ঢেউয়ের নীল পানি। দুই ঢেউয়ের মাঝখানে আমরা। তার পরনে শাদা পাজামা–পাঞ্জাবি। নীল পানির মাঝে তাকে শাদা পোশাকে কি দারুণ মানিয়েছে।

একি আমার পরনেও শাদা পোশাক! আমরা কোথায়?

তিনি বললেন, আমরা এখন সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে।

হ্যা, তাই তো আমরা একটি সাম্পানের মধ্যে বসে আছি। দূরে আরো সাম্পান ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝাকে ঝাকে সিবার্ড। কি যে ভালো লাগছে আমার!

ঘড়ির দিকে তাকালাম, নাহ। দশ মিনিট হতে এখনো চার মিনিট বাকি। আমরা দুজন সমুদ্রে সাম্পানে করে ভেসে বেড়াচ্ছি। ঢেউ থেকে পানি এসে আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে।

এই প্রথম নীরবতা ভেঙে তিনি বললেন, আমার খুব ভালো লাগছে।

তোমার?

আমারও ভীষণ ভালো লাগছে। ইচ্ছে করছে আপনাকে একটু ছুয়ে দেখি। আপনি কি আমার হাত দুটো ধরবেন?

তিনি আমার হাত ধরলেন। সাম্পানটি গভীর ঢেউয়ের ভেতর একবার ঢুকছে আবার ভেসে উঠছে। আমি তার হাত শক্ত করে চেপে আছি। আমার চোখ দুটো তারই দৃষ্টিতে আটকা পড়েছে।

জীবন জুড়ে লাগুক পরশ।
ভুবন ক্ষেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আখি তার।
আমার সকল রসের ধারা তোমাকে আজ হোক না হারা।

এ কথা কখনোই বলা হবে না। আই লাভ ARS। আমি কোনোদিনই জানতে দেবো না তাকে। শুধু দশ মিনিটের এই নৌ ভ্রমনটি স্বপ্নের মাঝে আসবে বার বার, বহুবার, বারংবার।

নাম ঠিকানা বিহীন

কমান্ডো সোলজার্স নেভার ডাই

- জনৈক কমান্ডো

পয়তাল্লিশজন প্যারাট্রুপার নিয়ে এয়ারফোর্সের এএন–বত্রিশ কার্গো বিমানটি ঠিক যখন পাচ হাজার ফিট উচুতে তখনই ক্যাবিনের লাল বাতিটা নিভে গিয়ে কলিজা হিম করা *প্যাপ প্যাপ* শব্দ করতে করতে হলুদ বাতি জ্বলতে আর নিভতে লাগলো। জাম্প মাস্টার তখন তার পিলে চমকানো চিৎকারে *হুক আপ স্ট্যাটিক* বলে জানিয়ে দিলেন লাইভ ড্রপ–এর সময় আসন্ন। জাম্পের জন্য বিমানের র‍্যামডোর আগেই খুলে দেয়া হয়েছে। সেখান দিয়ে হিম শীতল ঠাণ্ডা বাতাস এয়ারক্রাফটের ভেতরে ঢুকে ঠাণ্ডা এবং টেনশনের তীব্রতা জানিয়ে দিচ্ছে প্রতিটি প্যারাট্রুপারদের শরীর ও মনকে। তবুও মুখে হাসি, তারা কমান্ডো যে! আমরা সবাই জ্যাম্পের জন্য রেডি।

ওয়ারেন্ট অফিসার মোস্তফা এক নাম্বার এবং আমি দুই নাম্বার উইন্ড টেস্টার। আমাদের টেস্ট জাম্পের পরই নবীন শিক্ষার্থীদের লাইভ ড্রপ। হঠাৎ পাইলটের জানে পানি শুকিয়ে যাওয়া বেতার কথোপকথন, প্যান্থার

ওয়ান ফর ড্রপ জোন কন্ট্রোল, মুভিং ফর ডামি ড্রপ ফ্লাই পাস্ট। ড্রপ জোন কন্ট্রোল ডামি ড্রপ ফ্লাই পাস্ট – রজার।

আমরা ফাইনাল চেক শেষ করে সবাই জাম্পের জন্য রেডি। এ সময় সাধাণত *চাচা আপন প্রাণ বাচা* অবস্থা সবার। এর ভেতরও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের নম্র ও মৃদুভাষী কিন্তু আপন কাজে অতি দক্ষ ওয়ারেন্ট অফিসার মোস্তফা সব জাম্পারদের, বিশেষভাবে আমাকে অভয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কি স্যার, ভয়ে করছে? কোনো ভয় নেই, জাস্ট ফলো মি।

তিন মিনিট পরেই হলুদ বাতি নিভে সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো আর সাইরেনটা একটানা হিম শীতল *প্যা প্যা* শব্দ করার সঙ্গেই পাইলটের চিৎকার, ড্রপ জোন কন্ট্রোল ড্রপিং ফর লাইভ ফাইভ ইন ফাস্ট রান। ড্রপ, ড্রপ, গো।

সঙ্গে সঙ্গে জাম্প মাস্টারদের চিৎকার গো–ও–ও–ও।

মোস্তফা নিজের চিন্তা না করে আমাকে হাত দিয়ে ছুয়ে, স্যার গো! বলে বিমান থেকে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত ভয় এক নিমিষে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সাহসী হয়ে পলকে আমিও তার সঙ্গে বিমান থেকে জাম্প আউট করলাম।

প্যারাশুট খুললো। আকাশেও আমাকে নিয়ে মোস্তফার চিন্তার শেষ নেই। তার অভয় বাণী, স্যার, নো চিন্তা, ফলো মি।

সুন্দরভাবে আমরা ড্রপ জোনে টি–এর কাছে ল্যান্ড করলাম।

এই হলেন একজন অতীব বন্ধুবৎসল কাজপাগল সেনা কমান্ডো ওয়ারেন্ট অফিসার মোস্তফা।

এরপর কি প্যারা জাম্পে, কি রাতের কমান্ডো এক্সারসাইজে, গভীর জঙ্গলে একা চলতে, সব সময়ই মোস্তফার একটা সাহায্য এবং অভয়ের চাদর যেন আমিসহ সব কমান্ডোদের আবৃত করে রাখতো।

এই তো কয়েক বছর আগের কথা। এই অকুতোভয় ও বন্ধুবৎসল কমান্ডোসহ আমরা বাংলাদেশের কয়েকজন কমান্ডো ইউএস আর্মির স্পেশাল ফোর্সের সঙ্গে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইন ইনক্লিমেন্ট ওয়েদার–এর আওতায় অপারেশন *ব্যালান্স বাফেলো* এক্সারসাইজ করতে কক্সবাজার এলাকায় যাই। ইউএস স্পেশাল ফোর্সের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে নির্বিকভাবে আমরা আমাদের কার্যক্রম সম্পাদনের এক পর্যায়ে ছিল বিচ প্যারা ড্রপিং, বিচ ল্যান্ডিং, এমফিবিয়াস রেসকিউ অপারেশন।

সেদিনকার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে, চল্লিশজনের বিচ জাম্প সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলো। এরপর জেমিনি বোটে সেকশনওয়াইজ এক মাইল উত্তাল সমুদ্র পাড়ি ও রেসকিউ অপারেশন। সকলে সুন্দরভাবে বোটে ওঠার পর সমুদ্রের ঢেউ–এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শক্তিশালী জেমিনি বোট তার আরো শক্তিশালী ইঞ্জিনের গগনবিদারী আওয়াজ তুলে এক মাইল যাত্রা শুরু করলো। ছয়টি বোট, চল্লিশজন যাত্রী। ওয়ারেন্ট অফিসার মোস্তফা তিন নাম্বার এবং আমি চার নাম্বার বোটে।

সেদিন সমুদ্র ছিল বেশ অশান্ত। প্রকৃতই বৈরী আবহওয়া। আমাদের অনুশীলনের জন্য আদর্শ সময়। আধা মাইল যাত্রার পর হঠাৎ দেখলাম প্রচণ্ড একটা ঢেউয়ে আমাদের মাথার দুই মিটার ওপর দিয়ে, মোস্তফাদের বোটটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে ম্যাচ বাক্সের মতো ঠুনকোভাবে নাচছে। সবাই নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত থাকা অবস্থাতেও আমি স্পষ্ট মোস্তফার আশ্বাস বাণী শুনতে পেলাম, শাবাশ কমান্ডো, কোনো ভয় নেই।

সব কিছুই ঘটছিল চোখের পলকে। বোটগুলো মনে হচ্ছিল একটুও আগাচ্ছে না। এর ভেতরই ঘটে গেল আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনাটি। ঢেউয়ের মাথায় খেলতে থাকা মোস্তফাদের বোটটি রোলার কোস্টারের গতিতে শখানেক ফিট নিচে নেমে গেল এবং আরেকটা আরো বড় ঢেউয়ে সেটা উল্টে গিয়ে সাগরের অতলে হারিয়ে গেল। আমরা সবাই নিজেকে বাচানোর মধ্যেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। সমস্ত ঘটনাটাই ঘটলো কয়েক মুহূর্তে।

সবাই বাস্তবে ফিরে আসতেই চিৎকার করে উদ্ধার কাজের জন্য আগাতেই দেখি মোস্তফাদের রেসকিউ বোটটি উল্টে পড়ে আছে। ইঞ্জিনের প্রপেলর প্রচণ্ড গতিতে ঘুরছে এবং আশপাশের এলাকার পানি রক্ত লাল। সবার লাইভ জ্যাকেট পরা থাকায় বোটের যাত্রীদের একটু দূরে পানির উপরে ভাসা অবস্থায় উদ্ধার করতে আমরা সক্ষম হলাম। কাউন্টিং-এ দেখা গেল মোস্তফা ছাড়া সকলকেই উদ্ধার করা গেছে।

চারদিকে হন্তদন্ত হয়ে আমাদের খোজাখুজিতে বোধ হয় অশান্ত সমুদ্র একটা ক্রূর হাসি হেসে বড় একটা ঢেউ এগিয়ে দিল ঠিক আমাদের কাছাকাছি থাকা রেসকিউ বোটগুলোর সঙ্গেই। আমরা অবাক বিষয়ে পলকহীন চোখে অবিশ্বাস্যভাবে আবিষ্কার করলাম ইঞ্জিনের প্রপেলারে ছিন্ন-ভিন্ন দেহের ইউনিফর্ম ও লাইভ জ্যাকেট পরা একজন কমান্ডো। সব কিছু যেন একটা হ্যালুসিনেশনের ভেতর মুভি ক্যামেরার স্লোমোশন এপি সোডের হচ্ছে আর আমরা তাতে অভিনয় করছি। একটা ঘোরের মধ্যে ছিন্ন-ভিন্ন দেহটা সমুদ্রের পানির সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে যাওয়া রক্তের ভেতর থেকে তুলতেই একজন কমান্ডোর গগনবিদারী চিৎকার স্যার, এ যে আমাদের ওয়ারেন্ট অফিসার মোস্তফা।

তাকিয়ে দেখি মানব দেহ বলে চেনাই কষ্টকর। রক্তে একাকার সারা শরীর প্রপেলারের আঘাতে ছিন্নভিন্ন। একবার তাকিয়েই আমার মনে হলো আমি কেন বেচে রইলাম। এক সেকেন্ড আগের হাস্যোজ্জ্বল একজন কমান্ডো, এখন একখণ্ড গলিত মাংসপিণ্ড।

আমার গলার কাছে কান্না জমেছিল। চেষ্টা করেও চিৎকার করতে পারছিলাম না। শুধু কেদে উঠেছিলাম।

এরপরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত। হেলিকপ্টার এলো। আমরা মোস্তফার ছিন্ন-ভিন্ন দেহ নিয়ে বিচে এলাম। ডেড বডি নিয়ে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকা। পরিশেষে অন্তিম শয়নে তার পৈত্রিক নিবাসে।

আমার নৌপথ ভ্রমণ খুবই সংক্ষিপ্ত। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। কিন্তু এর ভেতর মোস্তফাকে হারানো আমার জীবনে একটা চরম ভয়ংকর ও দুঃখ জাগানিয়া দুঃস্বপ্ন।

আজ মোস্তফা নেই। কিন্তু তার স্মৃতি অনুক্ষণ আমায় তাড়িয়ে বেড়ায়। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, মোস্তফা, তুমি মরোনি, মরতে পারো না। কারণ তোমার কথাই তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলতে চাই, পাপা, মামা ডোন্ট ইউ ক্রাই, কমান্ডো সোলজার্স নেভার ডাই।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

সহযাত্রী কুকুর

– মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক আরিন্দা

আমাদের মামার বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে তেরো চোদ্দ মাইল দূরে হবে। স্বাধীনতার পূর্বে এখনকার মতো অতো রাস্তাঘাট ছিল না। খালে ছিল ভাঙা সাকো। আর ছোট নদীতে খেয়াতরী মাঝে মধ্যে মিলতো না। তাই শুকনো মরসুমে এতোগুলো ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে পায়ে হেটে মামার বাড়ি যাওয়া ছিল মায়ের জন্য দুঃসাধ্য। ফলে মাত্র বছরে একবার মামাবাড়ি যাওয়ার জন্য বর্ষাকালের অপেক্ষা করতে হতো।

মামাবাড়ি আমাদের এলাকা থেকে উচু এলাকায় বিধায় মা বলতেন, আমাদের পুকুর পাড়ে যখন একটা আম গাছের নিচে পানি আসে তখন নাকি মামাবাড়ি ঘাটে পানি যায়। আর তখনই আমরা মামাবাড়ি নৌকায় করে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে উঠতাম।

আমাদের গ্রামের জোহর আলী মাঝির নৌকা বাবা ভাড়া করে নিতেন। কারণ তিনি ছিলেন একজন ভালো হা-ডু-ডু খেলোয়াড়। কাজেই গায়ে শক্তি না থাকলে এতো দূরের পথ দিনে দিনে পাড়ি দিয়ে যাওয়া অন্যের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না।

মামাবাড়ি নৌকা ভ্রমণ করে যাওয়ার আনন্দে সবার আগে হই চই করে নৌকায় চড়ে যেতাম। কিন্তু এদিকে আমার বিদ্যানুরাগী বাবা অংকের বইখাতা সঙ্গে না নিয়ে উঠতে ভুলতে দিতেন না। তার কথা হলো, তা না হলে এতো দূরের রাস্তা বসে বসে কি করবো?

নৌকার সামনের গলুইয়ে কে বসবে তা নিয়ে অনেক সময় ভাইদের মাঝে মনোমালিন্য হতো। প্রাণপ্রিয় বাবা গলুইয়ের সামনে পানিতে শাপলা ফুল পড়লে তা ওঠাতে নিষেধ করতেন। কারণ তাতে নাকি অনেক সময় সাপ থাকে।

সারা দিন নৌকা ভ্রমণ করে সেই সন্ধ্যাবেলা মামাবাড়ির ঘাটে পৌছালে মামারা লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে এসে আমাদেরকে বাড়ি তুলতেন। পরের দিন সকাল থেকে যতোদিন থাকতাম, অন্যান্য মামাতো ভাইবোনদের নিয়ে হই চই আর দুষ্টুমি করে বেড়াতাম। যেমন পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা খাওয়া, বড় গাছের ডাল থেকে ঝাপ দিয়ে পানিতে পড়ে গোসল করা ইত্যাদি। কিন্তু দেখতাম বড়রা শাসন করার জন্য তেড়ে আসে না। কারণ তখন কি বুঝতাম, এ যে মামাবাড়ির আবদার!

যাক, সেই ছোটবেলার জীবনে একদিন দেখলাম, কোথা থেকে যেন একটা বেওয়ারিশ কুকুর এসে আমাদের বাড়িতে থাকছে। কুকুরটার প্রতি আমাদের তেমন আগ্রহ হলো না। কুকুরটাকে দেখলেই মা তাড়িয়ে দেন। শুনলাম কুকুর যে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে সে রাস্তা দিয়ে নাকি রহমতের ফেরেশতারা যায় না। সত্য মিথ্যা খোদা মালুম।

কিন্তু সেই সারা রাত আমাদের বাড়ি পাহারা দিয়ে চললো। তার কর্তব্যে কোনো অবহেলা নেই।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা সবাই পড়তে বসেছি। এমন সময় সেই সকালে ঘর থেকে বের হয়ে কোনো কাজে সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকেই বাবা আমার বড় বোনের দিকে চেয়ে বললেন, দেখ তো ঘরে কোনো খাবার আছে নাকি? সারা দিন আমি যেখানে গেছি কুকুরটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছিল। মনে হয় তার পেটে কিছু পড়েনি। তোরা কুকুরটাকে কিছু খাবার দে।

বাবার আদেশ মতো কুকুরটার জন্য বোন কিছু খাবার বাইরে ফেলেছিল।

তখন থেকে মায়ের বিরক্তি উপেক্ষা করে আমরা কুকুরটাকে ভালোবাসতে শুরু করলাম।

বছর ঘুরে আবার যখন বর্ষাকাল এলো, সেই মামাবাড়ি বেড়াতে যাওয়ার আয়োজন। সকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল করে কাপড়-চোপড় পড়ে সবাই নৌকায় চড়ে বসলাম।

নৌকা চলছে। অনেকক্ষণ পরে আমার এক ভাইয়ের নজরে এলো কুকুরটা সাতরিয়ে আমাদের নৌকার পিছু পিছু আসছে। তাই দেখে আশ্চর্য হয়ে বাবাকে বললো, বাবা, বাবা, দেখুন ওই যে আমাদের কুকুরটাও সাতরিয়ে আমাদের নৌকার পিছু পিছু আসছে।

কই দেখি দেখি বলে বাবা উকি মেরে সেই দৃশ্য দেখেই জোহর আলী চাচাকে বললেন, জোহর আলী, কুকুরটাকে টেনে নৌকায় তুলে নাও।

বাবার কথা মতো সে তা-ই করলো।

কুকুরটা নৌকায় উঠে গা ঝাড়া দিয়ে অসহায়ের মতো লেজ গুটিয়ে নৌকার এক কোণে চুপচাপ শুয়ে পড়লো। মনে হয় তার এই অসহায়ত্ব দেখে কেউ আর তাকে তাড়িয়ে দেবে না এমন একটা ভাব।

মা এই দৃশ্য দেখে বিরক্ত।

কিন্তু বাবার আদেশ, করার কিছুই নেই।

মামাবাড়ি গিয়ে তাকে কোনো কুকুরের আক্রমণের শিকার হতে হলো না। কারণ সে বাড়িতে কোনো কুকুর নেই বা আগেও কোনোদিন সেখানে কুকুর দেখিনি। মনে হয় শিক্ষাটা মা সেখান থেকেই পেয়েছেন।

যতোদিন আমরা সেখানে ছিলাম ততোদিন আমাদের ফেলানো উচ্ছিষ্ট খেয়ে কুকুরটা খুব সন্তুষ্ট। ফেরার দিন সবার আগে গিয়ে সেই আগের জায়গায় চুপচাপ লেজ গুটিয়ে শুয়ে আছে। পাছে আমরা নিষ্ঠুরের মতো তাকে ফেলে না আসি।

নৌকা চলছে।

এমন সময় কুকুরটার দিকে চেয়ে হাসি মুখে বাবা বললেন, দেখ দেখ, এই কয়েকদিনে কুকুরটা কেমন তাজা হয়ে গেছে? তিনি আরো বললেন, *জানিস, মানুষ তাজা এক মাসে, গরু ছাগল তাজা তিন দিনে, কুকুর তাজা একদিনে।*

প্যারিস, ফ্রান্স থেকে

কপাল

- এস.আর

পেশাগত দিক দিয়ে আমি জেলে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ডিগ্রি পাস করলেও চোদ্দ পুরুষের পেশাকে কখনো অবহেলা করতে বা বাদ দিতে পারিনি। তাই ছুটির অবসরে ছুটে যাই গ্রামে, সেই ডিঙি নৌকা। সঙ্গে হুইল। সে এক অভিনব মজা।

মনে পড়ে বারো বছর বয়সের কথা। বাবার সঙ্গে মাছের ঘোলাই নিয়ে নৌকায় করে রৌদ্রতপ্ত দুপুরে নদীতে ঘোরা এবং মাছ ধরা। সে যে কি কষ্টের ব্যাপার তা বলার উপেক্ষা রাখে না। এক দুপুর ভরা রোদে মাছ ধরে তা বাজারে বিক্রি করে তবেই জুটতো দুইবেলা খাবার। কোনোদিন এতো কম মাছ ধরা পড়তো যে, তা বিক্রির অযোগ্য হতো। ফলে সেই দিনে শুধু মাছ আমাদের খাদ্য তালিকায় স্থান পেতো। এভাবে নৌকা নদী আর মাছের সঙ্গে যুদ্ধ করে আজও টিকে আছি। কিন্তু সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদেরও উন্নতি হয়েছে। এখন অবশ্য মাছ শিকারের ওপর নির্ভর করতে হয় না।

১৯৯০ সালের একদিন। বাবার সঙ্গে নৌকায় করে বের হই মাছ শিকারের জন্য। প্রায় তিন চার ঘণ্টা পরিশ্রমের পরও কোনো মাছ পাইনি। বিষণ্ন মন, ক্ষোভ এবং অভিমানে সেদিন বাবা বাড়ি আসার জন্য উদ্যত হন। এমন সময় বাবাকে আরেকবার জাল ফেলার জন্য খুব জেদ করি।

আমার কঠোর জেদের চাপে বাবা আরেকবার জাল ফেলেন নদীর বুকে।

জাল টানার সময় দেখলাম বাবার মুখ ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে। বুঝলাম জালে মাছ ধরা পড়েছে। সত্যি সত্যি একটি বড় বোয়াল মাছ পেলাম।

খুব আনন্দে মাছটিকে নিয়ে আমরা ডাঙার দিকে নৌকা চালাচ্ছি। আমি মাছটির শরীর বার বার স্পর্শ করছি আর হাসছি। আমাদের নৌকা যখন ডাঙ্গার কাছে প্রায় এসেছে এমন সময় বোয়াল মাছটি আমার আঙুলে খুব জোরে কামড় দেয়। আমার হাতের আঙুল কখন যে মাছের মুখে গেছে টের পাইনি। সুতরাং *বাও* বলে চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠি। সঙ্গে সঙ্গে মাছের ঘোলাইটি পানিতে ছিটকে পড়ে। এবং বোয়াল মাছটিও তার নিরাপদ আবাস স্থল জলে চলে যায়।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে কাপতে থাকি এই ভেবে যে, এখন নিশ্চয় বাবার হাতে মার খাবো।

কিন্তু না। সেদিন তিনি আমাকে মারেননি। দেখলাম তার দুই চোখ দিয়ে শুধু দুই ফোটা জল নদীতে গড়িয়ে পড়লো।

তারপর আমাকে বুকে চেপে ধরে বিড় বিড় করে বললেন, *কপালে নাই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি?*

পুলহাট, দিনাজপুর থেকে

রিভার কাওয়াই

– একেএম আহসান উল্লাহ

এটা আমার জীবনের দ্বিতীয় নৌপথ ভ্রমণের কথা। থাইল্যান্ডের কানচনাবুড়ি প্রভিন্সের দরিদ্রতম একটি গ্রামের নাম লাওকোয়ান। ২০০১-এর শেষ দিকে আমরা বাইশজন ছাত্রছাত্রী দুই সপ্তাহের জন্য গিয়েছিলাম লাওকোয়ানে। ইচ্ছা ছিল অন্য কোনো প্রভিন্সে যাওয়ার। লববুড়ি, সুপানবুড়ি পেরিয়ে কানচনাবুড়ি গিয়েছি। তারপরেও যেতে হবে লাওকোয়ান। কারণ হচ্ছে, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কোনো গবেষণা কাজ হাতে নিলে তাদেরকে বেছে নিতে হবে দরিদ্রতম গ্রামগুলোকে এবং গবেষণালব্ধ ফল ওই গ্রামের সরকারি প্রশাসনে যারা রয়েছেন তাদের মাঝে উপস্থাপন করতে হবে ও একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। সরকার যাতে গ্রামের উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারে এই উঠতি গবেষকদের গবেষণার ফল।

লাওকোয়ান গিয়ে লাওকোয়ান খুজি আমি। আমার চোখ দেখে এআইটির ল্যাব সুপারভাইজার ভিতুন নিলউবল বললেন, এই তো লাওকোয়ান এসে গেছি আমরা।

এই দরিদ্রতম গ্রামটির প্রতিটি বাড়িতে দুই একটা গাড়ি, মোটর সাইকেল এবং বিশাল বিশাল ট্রাক্টর রয়েছে।

আমাদের তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে স্পেশালাইজেশন অনুযায়ী (এগৃকালচার ও ইন্ডাস্ট্রি) বিভিন্ন সেক্টরে তথ্য সংগ্রহে নামিয়ে দিলেন ড. জয়ন্ত রোটরে এবং ড. সোপার্থ পংকুয়ান। আমাদের প্রতিদিনের রুটিন হচ্ছে বের হতে হবে সকাল সাতটায় এবং ফিরে আসতে হবে রাত দশটায়। এসে ডিনার করে প্রেজেন্টেশন রেডি করতে হবে। উপস্থাপন করতে হবে সারা দিনের কাজের ফিরিস্তি। এভাবে আমাদের দুই দিন কেটে গেল। পরের দিন তুইজা-কারপানেন (ফিনল্যান্ডের নাগরিক) অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার বয়ফ্রেন্ডকে ডাকা হলো ব্যাংকক থেকে। সে এসেই তুইজাকে জড়িয়ে ধরে আমাদের সকলের সামনে শখানেক চুমু খেয়ে নিয়ে চলে গেল।

আমরা রইলাম একুশজন। তিন গ্রুপে এখন সমান ভাগে মিলেছে। ইওরোপিয়ানদের মধ্যে এখন রইলো মাত্র ইখসান মাথিলদা। থাইল্যান্ডের এআইটিবাসী তাকে *পাগলি* বলে ডাকে। এ কারণ ছিল মূলত দুটি যে, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া এবং ক্লাসেও গুনগুনিয়ে গান গাইতো থাই ভাষায় আর তার পোশাক-আশাক ছিল অদ্ভুত রকমের। কখনো এমন পোশাক সে পরতো যে, একজন নগ্ন নারী থেকে তাকে আলাদা করা কঠিন হতো।

এক সপ্তাহ পরের কথা। ভিয়েতনামি অধিবাসী আমার ক্লাসমেট কং বললো, সে এগারোজন ক্লাসমেটকে ম্যানেজ করে ফেলেছে নৌকা ভ্রমণে যাওয়ার জন্য। এরা হলো কিম মাও, কং, কিমঙ্যাং, হিউ (ভিয়েতনাম), সিব সেনেহ, ভ্যানারেন (কাম্বোডিয়া), মাথিলদা (নেদারল্যান্ডস), ভানসি চিন্দভং (লাওস), মিউ অং (মিয়ানমার), আতিতায়া (থাইল্যান্ড), আমি। এতো কঠিন রুটিনের মধ্যে একটু আনন্দ চাই।

যাবো কোথায়? রিভার কাওয়াই। বিশ্ব বিখ্যাত রিভার কাওয়াই। একে নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমা, পেয়েছে বিশ্ব জোড়া খ্যাতি। সেই রিভার কাওয়াই এই কানচনাবুড়িতে। মিয়ানমার-থাইল্যান্ড সীমান্তে দুই দেশকে আলাদা করেছে রিভার কাওয়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বন্দীদের দ্বারা পাথরের পাহাড় কেটে এই কাওয়াই-এর ওপরে নির্মাণ করা হয় *ডেথ* রেলওয়ে ও বৃজ যা সংযোগ করেছে থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারকে। সেই কাওয়াইয়ে যাবো, তাও রাতের বেলা! কিছু করার নেই। গেলে রাতেই যেতে হবে।

পরের দিন ফিল্ড থেকে ফিরে এসে আমরা এগারোজনের টিম (ছয়জন মেয়ে, পাচজন ছেলে) রাত সাড়ে নয়টায় রওনা দিলাম কাওয়াইয়ের উদ্দেশ্যে। ভোর পাচটার মধ্যে ফিরে এসে সাতটার সময় ফিল্ডে যেতে হবে আবার। মাইক্রোবাসে উঠে লক্ষ্য করলাম, আমি ছাড়া তারা সবাই শুধু অতি ছোট একটি হাফপ্যান্ট (আন্ডারওয়ারও বলা চলে) পরে চলছে রিভার কাওয়াই। সঙ্গে কয়েক কার্টন বিয়ার এবং আমার জন্য কোক।

কমনওয়েলথ ওয়ার সিমেটারি বা সমাধিস্থল কাওয়াই বৃজ থেকে বেশি দূরে নয়। হাজার হাজার নিহত সৈন্যদের সমাধি। তার পাশ দিয়েই আমরা গেলাম। *যুদ্ধ, ধ্বংস, মৃত্যু* এ শব্দমালাই মনে পড়ে গেল।

আমরা একটা স্পিড বোট ভাড়া নিলাম। ইঞ্জিন বিহীন এ স্পিড বোটে আছে দুটি বৈঠা। সকলকেই পর্যায়ক্রমে ধরতে হবে বৈঠা। আমার পালা পড়েছে সবার শেষে।

আমাদের ভ্রমণ শুরু হয়েছে। আনাড়ি হাতের বৈঠায় তো নৌকা চলে না। এদিকে ঘুরছে সেদিক ঘুরছে। তারপরেও চলছি আমরা। অন্ধকার, কিছু দেখছি না রাত ছাড়া। সারা দিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো শরীর। ভীষণ ক্লান্ত।

১৯৮৪–র স্মৃতিতে ফিরলাম। আমরা চার খালাতো ভাই – আমি, মুজাহিদ, ইব্রাহিম ও জাকারিয়া এক দরিদ্র মাঝির একটা নৌকা চুরি করে ঝালকাঠির আমতলী নদীতে ভ্রমণে গিয়েছিলাম। ঢেউয়ের পানিতে নৌকাটি ডুবে গিয়েছিল। আমরা সাতরে উঠে চারজন এক বাথরুমে পালিয়েছিলাম। নৌকার মালিক ঝালকাঠি সরকারি স্কুলের শিক্ষক (আমার খালু এখানকার শিক্ষক ছিলেন, সেই সুবাদে সেখানে বেড়াতে যাওয়া) বাসার সামনে এসে চিৎকার ও চেচামেচি শুরু করে...।

কং আমাকে ডেকে তুললো এবং বললো, তুমি আমার গার্লফ্রেন্ডের (কিম মাও) কোলে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছো। এবার ওঠো, বৈঠা ধরো।

সিংগাপুর থেকে
ahsan@722000@yahoo.com

বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না

- মাসুদ আলম মিষ্টি

আজ থেকে সাত আট বছর আগের কথা। তখন ক্লাস সিক্স অথবা সেভেনে পড়তাম। আমার আব্বা তখন চর এলাকায় ধান বা সুপারি কিনতেন। আমিসহ আরো কয়েকজন লোক নৌকা নিয়ে সেই ধান বা সুপারি নৌকা দিয়ে নিয়ে আসতাম।

একদিন নৌকা নিয়ে সুপারি আনছিলাম নৌকাতে বসে। নৌকা প্রায় ডুবি ডুবি অবস্থা। এখানে বলে রাখি, গ্রামীণ জনপথ তেমন ভালো না হওয়ায় নৌকা দিয়ে খালে খালে সুপারি আনছিলাম। নৌকায় ছিলাম আমি আমার আব্বা ও কয়েকজন মানুষ যারা আমাদের কাজ করেছে।

কিছু দূর আসার পর এক ছিদ্র দিয়ে আমাদের নৌকায় পানি ঢুকতে লাগলো।

এ অবস্থা দেখে আমার আব্বা সিদ্ধান্ত দিলেন নৌকার সব সুপারি নামিয়ে নিয়ে ছিদ্র বন্ধ করতে।

আমরা তাই করলাম।

সুপারি নামানোর পর সাময়িকভাবে ছিদ্র বন্ধ করে আব্বা আমাকে সেই নৌকায় রেখে আরেকটা নৌকা আনতে গেলেন।

নৌকায় একা আমার ভালো লাগছিল না। তাই নৌকায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর কে যেন আমার গায়ে পানি ছিটিয়ে দিল।

পাশে তাকিয়ে দেখি একটি অপরূপ রূপসী মেয়ে গোসল করছিল।

গ্রামের মেয়ে হিসেবে এতো সুন্দর হতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

মেয়েটি বিবাহিত। বয়স বাইশ বছরের মতো হবে। উল্লেখ্য, মেয়েটিকে এর আগেও কয়েকবার দেখেছি। তবে তেমন পরিচিত হয়নি। সেদিন তার নাম জেনেছিলাম।

তিনি বললেন, তার নাম পলি।

এতো কথা বলার পর এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, আমি কাপড়টা পাল্টিয়ে নিই।

আমি তখন ঘুমের ভান করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এক এক করে তিনি সব পাল্টালেন।

আমি অবাক হয়ে সব সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। আর তিনিও খোলামেলাভাবে সব পাল্টিয়ে নিলেন।

এর মধ্যে আব্বা নৌকা নিয়ে এলেন এবং আমরা সুপারি নিয়ে বাড়িতে এলাম।

এর বিশ দিন পর আবার সেই চরে সুপারি আনতে গেলাম। সুপারি বাগানে কাজ করার পর হঠাৎ তাকে দেখতে পেলাম।

তিনিও আমাকে দেখলেন এবং বললেন যে, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

অবাক হয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে আবার কি কথা থাকতে পারে! যাক, তার ঘরে গেলাম।

তিনি আমার জন্য নাশতা নিয়ে এলেন।

তখন বললাম, আমি আপনাকে তেমন চিনি না, আপনিও হয়তো আমাকে চেনেন না। তবুও আপনি আমাকে ডাকলেন এবং নাশতা নিয়ে এলেন কেন?

এই কথা বলার পর দেখলাম, তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

তাকিয়ে দেখতে পেলাম, সেই পানি মোছার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, কাদছেন কেন?

তখন তিনি বলতে লাগলেন, আমার বিয়ে হয়েছে আজ দশ বছর। বিয়ে হওয়ার ছয় মাস পর স্বামী বিদেশে চলে গেল। বিদেশ থেকে আবার সাত বছর পর এলো। আসার পর দাম্পত্য জীবন সুখেই কাটলো। হঠাৎ আবার তিন মাস পর চলে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেল যে মানুষ সাত বছর পর এলো সে মানুষ তিন মাস পরেই চলে গেল!

এই তিন মাসে তার বিবাহিত স্ত্রী কি পেল, কি পেল না সেটা একবারও ভাবলো না। ওই তিন মাসে তেমন কোনো সুখই পেলাম না। মানুষ বিয়ে করে সুখের আশায়। সেই সুখই যদি না পেলাম তাহলে এ জীবনের কোনো দামই নেই। পুরুষরা না হয় বুকে পাথর চেপে ধরে অন্যদের সঙ্গে জীবন কাটাতে পারে। কিন্তু আমরা তো সবার সঙ্গে মুখ খুলে কথাও বলতে পারি না। সেদিন নৌকায় আপনাকে ঘুমিয়ে থাকতে বলেছিলাম, আপনি আসলে ঘুমাননি। আপনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আপনাকে বুক দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলাম এই বুকে কতো কষ্ট! এই বুক যে কতো অসুখী!

এতোক্ষণ ধরে তার কথা শুনে আমারও কিছুটা দুঃখ হলো। যে স্বামীর জন্য রূপ যৌবন সব ধরে রাখলো, সে লোকটি তার প্রকৃত দাম দিতে পারলো না। হয়তো এসব কথা আমার কাছে বলে মনের দুঃখকে একটু হালকা করলেন। আমিও না হয় তার একটু দুঃখ ভাগ করে নিলাম। তবে এসব নারীদের ক্ষেত্রে একটা কথা স্পষ্ট করে জেনেছি যে, *মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।*

হয়তো সেদিন নৌকাটা নষ্ট হওয়ার ফলে একটা মানুষের দুঃখকে ভাগ করে নিতে পেরেছি।

দালাল বাজার, লক্ষ্মীপুর থেকে

জোক

- সোহেল

সকাল নয়টা বাজতে কিছু বাকি। হঠাৎ করেই মনে হলো আজ রবিবার। আজ তো হাসির সঙ্গে ঘুরতে যাবার কথা। নিজেকে প্রস্তুত করতে গিয়ে আমার হাত ঘড়ি নয়টার কাটা স্পর্শ করে ফেলে। কি করবো? কি করে

মহারানীর অভিমান ভাঙাবো তা ভাবতে ভাবতে এক সময় আমার ঘড়ি অনেক এগিয়ে। কিন্তু আমি তো এখনো বাসের অপেক্ষায়।

সময়ের ব্যবধানে পৌছে গেলাম নির্দিষ্ট স্থানে যেখানে মহারানীর অপেক্ষা করার কথা। কিন্তু না, হাসি তো নেই। তাহলে কি আমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে রাগ করে ফিরে গেল? আমি যখন ফিরে আসবো ভাবতেই পেছন ফিরে দেখি মহারানী দাড়িয়ে আছে। ভাবতে থাকি এখন থেকে শুধু বকা শুনতে হবে।

কিন্তু আমি যেই বলতে যাবো আমার দেরি কেন হয়েছে, তখনই হাসি আমার কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উল্টো নিজেই আমাকে *সরি* শব্দ বার বার শোনাতে থাকে। তখন আমার বুঝতে বাকি রইলো না আজ আমি দেরি করিনি। প্রথমেই বরাবরের মতো তার হাতে গিফট বক্স তুলে দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। আমরা দুজনেই দেখতে সম্পূর্ণ দুই রকম। হাসি এমনই এক মেয়ে যাকে দেখার পর যে কেউ দ্বিতীয়বার তাকাতে বাধ্য হয়। সবচেয়ে সুন্দর চোখ যেন বিধাতা তাকে দিয়েছে। তাই সহসা কখনো তার কোনো কথা ফেলতে পারতাম না।

সেদিন তার ইচ্ছা মতোই ঘুরতে যাই তুরাগ নদীর তীরে সকাল এগারোটা বাজে। মিষ্টি রোদ, দক্ষিণা বাতাস, নদীর কুল কুল শব্দে যেন আমরা হারিয়ে গেলাম অন্য পৃথিবীতে।

একজন লোক দূর থেকে আমাদের দেখে দৌড়ে এলো এবং হাপাতে হাপাতে বলতে লাগলো, *স্যার টাকা লাইগবো না, আপনে আপারে লইয়া আমার নৌকায় ঘুইরা বেড়ান।*

অনেকবার বোঝাতে চাইলাম আমি নৌকাতে চড়বো না।

কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা।

এক সময় তাকে বোঝাতে চাইলাম আমি নৌকা চড়ার জন্য আসিনি।

তবুও লোকটা কিছুতেই ফিরে যেতে রাজি হলো না।

অগত্যা বুদ্ধি করে নৌকার ভাড়া দিয়ে দিলাম এবং চলে যেতে বললাম।

কিন্তু এখন হাসি নৌকায় চড়ার জন্য রাজি হয়ে আমাকে নৌকায় উঠতে বললো।

বাধ্য হয়ে নৌকায় উঠলাম।

কিছু সময় পর নৌকা এসে থামলো তুরাগ নদীর বুকে। আমাদের নৌকা আকৃতিতে ছোট ছিল। তাই বাতাসে নৌকা আসতে আসতে পাগলামি করতে থাকলো। আমি হাসির হাত ধরে ভয়ে বললাম, আমি সাতার জানি না। তুমি কি করবে নৌকা ডুবে গেলে?

হাসি আমার হাত ধরে অভয় দিয়ে বললো, আমি সাতার জানলেও কাটবো না। কারণ মরতে হলে দুজনে এক সঙ্গে মরবো।

তার কথা শুনে আমার অতি সুখে চোখে জল এসে যায়। তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো লক্ষ্মী। আমার আর কোনো ভয় রইলো না।

এক সময় বিকেল হলো। সূর্যের আলোয় নদীর ঢেউ চিক চিক করলো। সুন্দর হয়ে উঠলো সব প্রকৃতির অলংকার। আমি হাত দিয়ে নদীর পানি ধরছি। এক সময় নৌকার কোণায় একটি কালো কি যেন দেখলাম। হাত দিতেই নরম অনুভূতি হলো। নরম জিনিসটা হাতে নিলাম।

হাসি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, সোহেল, এটা জোক।

শোনা মাত্রই লাফালাফি শুরু করলাম। এদিকে আমাদের ভালোবাসার তরী একেবারেই কিনারে এসে গিয়েছে। আমার চিৎকার ও লাফালাফিতে আমাদের ছোট নৌকার অবস্থা উল্টো হয়ে গেল। তখন হাটু পানি–কাদাতে আমি, হাসি ও নৌকাওয়ালার জামা–কাপড়ের অবস্থা শোচনীয় হলো। অবস্থা দেখে হাসিসহ সবাই হাসতে থাকলো। আমিও নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমিও হাসতে থাকি।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

মিস নৌকা

- সুইটি

আমার জীবনের এ গল্পটি কোনো কল্পকাহিনীর চেয়ে কম নয়। আমি একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বাবা খুব সরল মানুষ, ছোট ব্যবসা করেন। আমরা তিন বোন। তিনজনই সুন্দরী। ভাই নেই বলে মায়ের দুঃখের অন্ত ছিল না।

পরিবারের ছোট মেয়ে হিসেবে আমি ছিলাম সবার চোখের মণি। ছেলে সন্তান না থাকায় কষ্টটা বেশি অনুভব করতাম বলে মাকে বলতাম, আমিই তোমার ছেলে। ছেলেদের ছোটখাটো কাজ যেমন সওদা কেনা, বালব বদলানো, বিদ্যুতের বিল দেয়া এসব নির্বিঘ্নে করতাম। কিন্তু এই আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি যে, আমাকে কখনো এতো বড় ঘৃণ্য পেশা নিয়ে বেচে থাকতে হবে।

এবার মূল প্রসঙ্গের কথা বলছি। আমার বড় বোনের যখন বিয়ে হয় তখন আমি ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। কিন্তু আমার দৈহিক গড়নের কারণে সবাই ভাবতো আমি কলেজে পড়ি। আমার হবু দুলাভাই একটি ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলের নেতা হিসেবে স্বল্প সময়ে আঙুল ফুলে কলাগাছের অবস্থা।

গায়ে হলুদের দিন দুলাভাইয়ের চাচাতো ভাই বি আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। আমি আশ্চর্য হই আর খুব কৌতূহলীও হয়ে যাই হয়তো বয়সের কারণেই। কোনো কিছু না ভেবে দুলাভাইয়ের প্রশ্রয়ে বি-এর সঙ্গে গভীর প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করি। আত্মীয়তার সুযোগে বি প্রায়ই আমাদের বাসায় আসা-যাওয়া করতো। এভাবেই চলছিল।

একদিন দুলাভাই প্রোগ্রাম করে রাঙামাটি যাওয়ার। আমরা তিন বোন, দুলাভাই, বি আর দুলাভাইয়ের এক বন্ধু এ.আর। মাইক্রোবাসে করে আমরা রাঙামাটি বেড়াতে যাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরা রাঙামাটিতে এটা আমার প্রথম যাওয়া। মনে হচ্ছিল যেন কোনো স্বর্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। রাঙামাটি লেকের ধারে ছোট ছোট বিশ্রাম ঘরগুলোতে সবাই বসেছি।

এ.আর ও দুলাভাই সঙ্গে করে আনা বিয়ারগুলোর ছিপি খুলে আমাদেরকে দিচ্ছিল।

কিন্তু আমি ওসব খাবো না বলে সিদ্ধান্তে অটল রইলাম।

বিকেল প্রায় সোয়া চারটায় বি এসে জানালো, লেকের পানিতে নৌকায় চড়ার ব্যবস্থা আছে।

নৌকায় চড়ার শখ আমার দীর্ঘ দিনের। বি-এর প্রস্তাবে আমি তো আনন্দে দিশেহারা। বাকিরা বিয়ার আর চিপস খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলো। অগত্যা বি এবং আমিই নৌকা ভ্রমণে গেলাম। আমি সাতার জানি না, ভয় লাগলেও সাহস করে উঠে পড়লাম।

বি নৌকা চালাচ্ছিল। লেকের ওপাড়ে একটা দ্বীপের মতো স্থানে পৌছালাম।

নির্জন একটা দ্বীপের মতো স্থানে ছোট পাহাড়ের টিলা। সেখানেই দুজনে পাশাপাশি বসে কথা বলছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে বুকের ওপর কারো হাতের স্পর্শে চমকে ফিরে দেখি দুলাভাই! খুব আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, হয়তো দুষ্টুমি করছেন। কিন্তু এর মধ্যে এ. আর আমার বাম হাত ধরে একটা বাজে রকমের ইশারা করলো। বিস্মিত, অবাক হয়ে যাওয়া আমাকে জোর করে তিনজন মিলে পাহাড়ের আড়ালে নিয়ে গেল।

আমার মুখের ভেতরে কাপড় গুজে দেয়ার কারণে আমার সব শক্তি দিয়ে চিৎকারগুলো কেউ শুনলো না।

আমার চেয়ে বয়সে দ্বিগুণ দুলাভাই তার দক্ষ হাতে একে একে আমার সবগুলো কাপড় খুলে আমাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করলো। দাত দিয়ে কামড়ে সারা শরীর রক্তাক্ত করে দিল। এরপর দুটো ছবি তুললো। তারপর এলো এ.আর এবং সবশেষে বি। দীর্ঘক্ষণ নানানভাবে তার ক্ষিধে নিবৃত্ত করলো শিকারি পশুর মতো।

তিনজন পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলাম। বদলে গেল আমার পৃথিবী। নিজের অজান্তে কখন যে বি-এর সঙ্গে বিশ্রাম ঘরে ফিরলাম জানি না। ফিরেই দেখি বড় আপুরা বিয়ারের নেশাতে এলোমেলোভাবে গল্প করছেন। বুকের হাহাকার চেপে ধরে নীরব, নির্বাক বসে রইলাম।

অল্পক্ষণ পর দুলাভাই সবাইকে গাড়িতে ওঠার জন্য ডাকতে লাগলেন। গাড়িতে ওঠার আগে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, কি, নৌকায় চড়েছো? আরো চড়বে?

আমি নিশ্চুপ। মনে হচ্ছিল জগতের সব নিস্তব্ধতা আমাকে গ্রাস করেছে। নৌকার কথা বলে বলে সারাটা পথ জুড়ে তারা তিনজন আমাকে বার বার উত্যক্ত করলো।

এ ঘটনার মাস তিনেক পর বাবা মারা গেলেন। সংসারে নামলো অভাবের অন্ধকার। আমরা মা-মেয়ে কাপড় সেলাই করে বহু কষ্টে সংসার চালাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে ছবির ভয় দেখিয়ে এ.আর, বি এবং দুলাভাই আমার জীবনটা দুর্বিষহ করে তুললেন। আমি তাদের হাতের পুতুল হলাম। বোনের সংসারের কথা ভেবে, সমাজের কথা ভেবে কোনো প্রতিবাদ করলাম না। তারা আমাকে নানানভাবে ব্যবহার করতে শুরু করলো।

আজ দীর্ঘ দিন পরও আমি তাদের হাতে জিম্মি। তবে এর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন!

কাগজের নোট হাতে নিয়ে এখনো নৌকায় চড়ি।

তারা তিনজন আমার মাঝিমাল্লা। শহরের বহু নামিদামি মানুষ আমার ভ্রমণসঙ্গী যাদের সামাজিক মর্যাদা, বাড়ি-গাড়ি, টাকা-পয়সা, ঘরে সুন্দরী বৌ, পুত্র-কন্যা সবই আছে। আমি তাদের বড়ই আপন সেই বিশেষ মুহূর্তের জন্য।

তাদের কাছে, তাদের দেয়া আমার ছন্দনাম *মিস নৌকা।*

ঠিকানা বিহীন, চট্টগ্রাম থেকে

গরু

- মোহাম্মদ আম্বর আলী

১৯৮৮ সাল। ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ছোট নৌকা নিয়ে এই বন্যার পানি দেখতে বেরিয়েছি। বন্যা দুর্গত এলাকায় বেশির ভাগ বাড়িঘরই পানিতে তলিয়ে গেছে। বাড়িঘর ছেড়ে মানুষ উচু এলাকায় আশ্রয় নিতে চলে গিয়েছে।

আমাদেরকে নৌকা নিয়ে বেড়াতে দেখে এক বাড়ির টিনের চালের ওপর থেকে একজন বৃদ্ধ লোক আমাদেরকে ডাক দেন।

আমরা কাছে গেলে দেখতে পাই সেখানে পানির ওপর শুধু মাথাটা উচু করে জাগিয়ে একটি গরু দাড়িয়ে আছে।

বৃদ্ধ লোকটি আমাদেরকে তার গরুটি অন্য একটি উচু স্থানে পার করে দিতে বলেন। নৌকার অভাবে তিনি গরুটি অন্য কোথাও সরাতে পারেননি।

আমাদের নৌকাটি ছিল খুবই ছোট। তাই আমরা প্রথমে গরু পার করতে অস্বীকার করি। কিন্তু বৃদ্ধের করুণ আকুতি দেখে পরে রাজি হই। আমাদের মধ্য থেকে দুজনকে চালের ওপরে নামিয়ে রেখে নৌকার মাচার ওপরে কচুরিপানা বিছিয়ে গরুটিকে তুলে নিই। বাড়ি থেকে সামান্য কিছু দূরে যাওয়ার পর পরই গরুটি একদিকে ঝুকলেই নৌকাটি ডুবে যায়।

নৌকা ডুবে যেতে দেখে আমাদের দুই বন্ধু টিনের চাল থেকে নেমে আমাদের কাছে আসে। আমরা কোনো রকমে ডুবে যাওয়া নৌকাটি ধরে টানতে টানতে সেই বাড়ির ভিটাতে নিয়ে যাই।

গরুটি কোনোদিকে ডাঙা দেখতে না পেয়ে এদিক-সেদিক সাতার কাটতে থাকে।

আমরা নৌকা সেচে জাগিয়ে তুলতে তুলতে দেখি হঠাৎ গরুটি পানিতে তলিয়ে গেল।

গরুটিকে পানির নিচে তলিয়ে যেতে দেখে বৃদ্ধ লোকটি হাউমাউ করে কাদতে শুরু করলেন।

বৃদ্ধের কান্না দেখে আমরাও চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। অসহায় বৃদ্ধের সম্পদ একটি গরুকে আমরা চেষ্টা করেও বাচাতে পারিনি। আজও আমার সেই স্মৃতি মনে পড়লে পানিতে চোখ ভিজে আসে।

গেরুয়া, সাভার থেকে

মি. ইউগান্ডা

- জুয়েল

প্রায় ছয় বছর আগের কথা। আমার বাচ্চার বয়স তখন ছয় মাস। আমাদের বিয়েও হয়েছে বছর দেড়েক আগে। বুঝতেই পারছেন দুটি নতুন অভিজ্ঞতায় উত্তেজিত, আনন্দিত এবং বিপর্যস্ত। শেষের বিশেষণ লাগালাম। কারণ আমার স্ত্রী প্রায় দুই মাস তার বাপের বাড়িতে অবস্থান করছে।

গিন্নির বাপের বাড়ি অর্থাৎ আমার শ্বশরবাড়ি বরিশাল শহরে। প্রায়ই ছুটি নিয়ে অথবা ম্যানেজ করে ছুটতাম দুজনকে দেখতে। যাদের বাড়ি দক্ষিণ অঞ্চলে তাদের কাছে লঞ্চে ভ্রমণের কথা বলা বাহুল্য। আবার যারা বরিশাল লঞ্চে নিয়মিত যাতায়াত করেন তারা তো জানেনই বিলাসবহুল লঞ্চগুলোর কথা। ওই লঞ্চগুলোতে প্রায়ই যেতাম। বাসে যেতে আরো ভয় করে। বেশ আরামের জার্নি। সুন্দর ক্যাবিন। কোনোটাতে আবার এসিযুক্ত, ভিডিও দেখার ব্যবস্থা আছে। তবে খবরদার! খাবার–দাবার সঙ্গে নিয়ে আসবেন। কারণ ওদের খাওয়া মজা হলেও বিল দেয়ার সময় মনে হবে ওই কথা, *কাইট্যা ছিল্লা লবণ লাগাইয়া দিমু*।

তা যাই হোক। একবার ওই রকম একটি লঞ্চে গিয়েছিলাম। আগে টিকেট কাটা ছিল না বলে সদরঘাটে লঞ্চে ওঠার আগে টিকেট কাটলাম।

কিন্তু কোনো সিংগল ক্যাবিন নেই। ডাবল ক্যাবিন আছে। ডাবল ক্যাবিনে সিংগল যাওয়া মানে কোনো অপরিচিত লোকের সঙ্গে যাওয়া। আমার অবশ্য খুব একটা খারাপ লাগে না, আগেও গিয়েছি। নতুন লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে ভালোই লাগে। তার ওপর ভিডিও দেখে সময় কাটিয়ে ঘুম দিলেই বরিশাল। তারপর *শ্বশুরবাড়ি মধুর হাড়ি।*

ক্যাবিনে লাগেজ রাখার পর বারান্দায় পায়চারি করছিলাম। একটু পর দেখলাম একজন ইউগান্ডা টাইপের এক ভদ্রলোক। মানে যেমন লম্বা, তেমন চওড়া, তেমনি কালো এবং ভয়ংকর চেহারা। তিনি চেচাতে চেচাতে আমার ক্যাবিনে ঢুকলেন। একগাদা খিস্তি নিক্ষেপ করতে লাগলেন বয়দের, কেন তারা তাকে সিংগল ক্যাবিনের বদলে ডাবল ক্যাবিন দিল ইত্যাদি।

ইউগান্ডার জন্য নয়। এই রকম আচরণ সম্পন্ন লোকের সঙ্গে কিভাবে জার্নিটা করবো এই চিন্তায় মগ্ন হলাম।

বয়কে চুপি চুপি ডেকে আর কোনো ক্যাবিন খালি আছে কি না জিজ্ঞাসা করলাম।

সে নেতিবাচক উত্তর দিল। কি অসুবিধা আছে এই ক্যাবিনে এমন একটা প্রশ্ন করে বসলো।

প্রসঙ্গ বদলে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। লঞ্চ চলা শুরু করলো। ভদ্রতাবশত কথাবার্তা শুরু হলো। তিনি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদার, আবার তার গার্মেন্টসের ব্যবসাও আছে। কথাবার্তাতে একটু পরে তাকে তেমন একটা খারাপ মনে হলো না, বরং তার সম্পর্কে আমার আগের ধারণার জন্য মনে মনে একটু অনুতপ্ত হলাম বৈকি।

এভাবে কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। খাবারের সময় এলো। আমি তাকে আমার খাবার শেয়ার করার জন্য অফার করলাম।

কিন্তু তিনি বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি রাতে তেমন কিছু খান না বলে জানালেন।

এরপর সময় কাটানোর সঙ্গে কেনা ম্যাগাজিন পড়তে লাগলাম।

একটু পর ভদ্রলোক বাইরে থেকে এসে ক্যাবিনের বিছানায় আরাম করে বসে আমাকে বললেন, কিছু মনে করবেন না ভাই, আমি একটু ড্রিংক করবো।

হতবাক হলাম মনে মনে ভাবলাম, মদ খেয়ে মাতালামো করে আবার কোনো অঘটন ঘটিয়ে দেয়। আমি অবশ্য ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখলাম।

তিনি একটি পেটমোটা বোতল বের করে গ্লাসে ঢেলে পানি মিশিয়ে গিলতে শুরু করলেন। অবশ্য তিনিও ভদ্রতা দেখালেন। আমাকেও অফার করলেন।

আমি বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলাম।

তিনি বললেন, আপনি মিস করলেন। এটা বিলেতি মাল। খাসা এক নাম্বার জিনিস।

শুকনো হাসি উপহার দিলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, তুই ব্যাটা খা, আমাকে ঘাটাস না।

একটু পর তার বোধ হয় সুরার এফেক্ট হওয়া শুরু করেছে। তিনি প্রফুল্ল চিত্তে তার অতীতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগলেন এবং কোন কোন রথি-মহারথির সঙ্গে সুরার আসরে বসেছেন তার কথাও বললেন, দুই একজন তো দেখলাম জাতীয় ফিগার।

মনে মনে ডাবল ক্যাবিনে কেন সিংগল গেলাম এই অনুশোচনায় জ্বলতে লাগলাম। এরপর যদি একটা যাই তবে ডেকে যাবো। কিন্তু ডাবল ক্যাবিনে যাবো না বলে প্রতিজ্ঞা করতে লাগলাম।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়, তিনি তার অভিজ্ঞতার বর্ণনার এক পর্যায়ে ব্যাগ থেকে একটি পিস্তল বের করে আমাকে দেখালেন এবং বললেন, আমার প্রফেশনে মাঝে মধ্যে এটার দরকার হয়। আমি শিওর তখন কয়েকটা হার্ট বিট মিস করলাম।

তিনি অভয় দিলেন, এটার লাইসেন্স আছে।

আমিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমার নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। কারণ ব্যাটা ইউগান্ডা অলরেডি লোডেড এবং বোধ হয় পিস্তলটাও, কখন একটা গুলি করে বসে! বৌ-বাচ্চা আছে আবার ব্যাগে স্ত্রীকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য একটি সোনার নেকলেস আছে যা অনেক কষ্টে বানিয়েছি, সেটা না আবার লোপাট করে, ইত্যাদি দুশ্চিন্তায় এসি রুমে রীতিমতো ঘামতে লাগলাম।

কায়দা করে ইউগান্ডার অগোচরে নেকলেসটা বের করে বাথরুমের অজুহাতে ক্যাবিন থেকে বের হয়ে লঞ্চে সামনে একটি চেয়ারে বসে রইলাম। নদীর বাতাসে মন একটু শান্ত হলো।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ক্যাবিনের জানালা দিয়ে উকি মেরে দেখি তিনি ঘুমাচ্ছেন। আমি পা টিপে টিপে ক্যাবিনে ঢুকলাম। দেখলাম তিনি বেশ আয়েশের সঙ্গে নাক ডাকছেন। ভাবলাম এ আবার কোন জ্বালা শুরু হলো! তবু জেগে থাকার থেকেও তো অনেকগুণ ভালো।

সেই রাতে আর ঘুমাতে পারলাম না। প্রায় রাত সাড়ে তিনটায় লঞ্চ ঘাটে ভিড়লো। আমি তৈরিই ছিলাম। তাড়াতাড়ি লঞ্চ থেকে নেমে পড়লাম।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

ibnulhossain@yahoo.com

ডুবোচর

- আবুল হাশেম বাবুল

ঢাকা থেকে যাবো কুয়াকাটা। যেখানে সাগরের বুকে সূর্য ডোবে। সঙ্গী ফারুকভাই। তার বাড়ি পটুয়াখালীর দুমকিতে। আমার বাড়ি মুন্সিগঞ্জের লৌহজং। লঞ্চ ছাড়ার কথা ঠিক সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। লঞ্চের নাম *এমভি সাত্তার খান।* সে এক বিশাল লঞ্চ। প্রায় চারশ যাত্রী কেবল শুয়ে যেতে পারে তার ডেকেই।

যাহোক, সময় মতো পৌছাতে পারিনি। লঞ্চটা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

ফারুকভাই দেখতে পেয়ে আমাকে ডাকছিলেন লঞ্চের ওপর থেকে।

দৌড়ে পাশের লঞ্চে উঠে তার পেছনে দিক দিয়ে কোনো রকমে ধরতে পেরেছি সাত্তার খানের সামনের দিকটা। টেনে হেচড়ে উঠেও গেলাম কোনো রকমে।

লঞ্চে বহুবার চড়েছি। তবে এতো বড় লঞ্চে ওঠার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। ক্যাবিনের ব্যবস্থা করা যায়নি। তাই ডেকেই যেতে হবে। কিছু করার নেই। রাত তখন প্রায় তিনটা। ফারুকভাই কেমন করে যেন জায়গা করে ঘুমিয়ে গেলেন। বসে বসে গল্প করছি কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে। এক সময় ভালো না লাগায় সিড়ি বেয়ে উঠে গেলাম উপরে। তিন পুরুষ আর এক মহিলা কার্ড খেলছে। এমন নদী ভ্রমণ সঙ্গিনী ছাড়া যে জমে না তা বুঝলাম। নিচে এসে গানের শেষ কলিটা লিখে শেষ করতেই একটা বিকট শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চটা স্থির হয়ে গেল। মহিলাদের আর্ত চিৎকার শুরু হলো। তখনো রাত অনেকটাই বাকি।

দৌড়ে ছাদে উঠতে উঠতে ডুবে যাওয়া *সালাউদ্দীন* ও *নাসরিন* নামের দুটি লঞ্চের কথা ভাবছি। ছাদে গিয়ে দেখলাম, আমাদের লঞ্চটা আটকে গেছে ডুবোচরে। অনুভূতি হলো যেন যমের হাত থেকে ফিরে এলাম।

কেউ কেউ বলছিলেন, এসব ডুবোচরে নাকি চুরি-ডাকাতি হওয়ার আশংকা খুব বেশি। তাই যদি হয় তাহলে আমি মনে করি, এসব ক্ষেত্রে বিশেষ বাহিনীর টহল থাকা জরুরি।

প্রায় এক ঘণ্টা পর ডুবোচর থেকে নামে সাত্তার খান।

বছর চলে গেলেও ভুলতে পারিনি সেই লঞ্চ ভ্রমণের স্মৃতি। হয়তো আর কোনোদিনই ভোলা যাবে না।

ইসলামপুর, ঢাকা থেকে

নির্জন হাওড়ে

– এফ.এম মোছাব্বির

কর্মব্যস্ততার ফাকে সময় পেলেই ছুটে যাই গ্রামে। হই হুল্লোড়ে সময় কাটিয়ে ফিরে আসি যান্ত্রিক জীবনে। কয়েক বছর আগে মামাবাড়ি গিয়েছিলাম বর্ষাকালে। বিস্তীর্ণ কৃষি জমি ও জলাভূমি পানিতে টইটম্বুর। ঢাকা থেকে ছোট খালাও এসেছেন একমাত্র মেয়ে সুমিকে নিয়ে।

খালা ফৃ মাইন্ডেড মহিলা। তাই তাকে ম্যানেজ করে সুমি আর আমি ডিঙি নৌকা নিয়ে বের হলাম হাওড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবো বলে। হাওড় এলাকার নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে সুমি একেবারে বিমোহিত।

ওর উচ্ছ্বাসে আমিও উচ্ছ্বসিত হই। দীর্ঘ দিন ধরে যার ছবি হৃদয় গহীনে লালন করে চলেছি, হৃদয়ের রাণী, কল্পনার সেই মানসী আজ আমার পাশে। তার পারফিউমের গন্ধ আমাকে আলোড়িত করে। কল্পনার ভেলায় চড়ে আমি যেন ভেসে চলেছি দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে। কোথাও কেউ নেই, শুধু সে আর আমি।

ওর কথায় সংবিৎ ফিরে পাই। অনেক দিন পর দেখা, তাই তার মুখে যেন কথার খৈ ফুটছে। কথা বলছে তো বলছেই।

আমি ধ্যান মগ্ন হয়ে তার দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছি।

এদিকে মি. আকাশ মুখ গোমড়া করে আছে যেন হিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরে যাচ্ছে। সেদিকে আমাদের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। আমাদের অভিসার ওই আকাশ ব্যাটার যেন সইছিল না। বিদ্যুৎ চ্ছটা আর মেঘের গর্জনের প্রচণ্ডতায় সংবিৎ ফিরে পাই আমরা। বাড়ি থেকে অনেক দূরে নিজেদের আবিষ্কার করি। দেখতে দেখতে অমাবস্যার মতো গাঢ় অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেল। শন শন বাতাসের প্রভাবে পরিবর্তিত হলো নৌকার গতিপথ। মেঘের তোড়জোর এবং আকাশের বৈরী অবস্থা দেখে সুমি হাউ মাউ করে কাদতে লাগলো।

এর মধ্যে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হলো। আমি বাড়ির দিকে হাল টানার চেষ্টা করছি। হঠাৎ কাছে কোথাও প্রচণ্ড গর্জনে বজ্রপাত হলো।

ভয়ে সুমি আমাকে জাপটে ধরলো।

নির্জন হাওড়ে এ রকম পরিস্থিতিতে আরো অনেকবার পড়তে হয়েছে আমাকে। তাই ভয় না পেয়ে সুমিকে অভয় দেয়ার চেষ্টা করলাম।

ভয়ে সে চোখ খুলছে না। আমাকে আকড়ে ধরে আছে শক্তভাবে।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলাম আশপাশে কেউ আছে কি না! না হলে গ্রামে কেচ্ছা রটে যাবে। নিশ্চিন্ত হলাম কেউ নেই। এদিকে সুমির স্পর্শে ধীরে ধীরে আমি যেন বদলে যেতে লাগলাম। তার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার আর চেষ্টা করলাম না। পরম আবেশে আমার বুকে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। দুই হাতে তার মুখ তুলে বললাম, ভয় পাচ্ছো কেন? আমি আছি না!

এমন ভীতিকর অবস্থায়ও সুমি কেমন যেন একটা ইঙ্গিত পূর্ণ হাসি দিল।

আমি একেবারে ভড়কে গেলাম। তার হাসির রহস্যের কিনারা করতে গিয়ে তার পর মুহূর্তেই যেন বদলে গেলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষে।

উপরে গগনবিদারী তীব্র গর্জন আর নিচে নির্জন হাওড়ে ছোট্ট এক ডিঙি নৌকার বুকে দুটি মানব-মানবী একে অন্যের মাঝে হারিয়ে গেল পরম নিশ্চিন্তে।

এক সময় মেঘ কেটে গেল। বৃষ্টিও কমতে লাগলো। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির রুদ্র রূপ থেকে নিস্তার পেয়ে আমরা বাড়ি ফিরলাম। রাতে সুমির জ্বর এলো। তাকে ওষুধ খাইয়ে খালা ও অন্যরা শুয়ে পড়লেন। আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না। আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। কপালে হাত দিয়েই দেখি প্রচণ্ড জ্বর। আমি জলপট্টি দিতে লাগলাম।

সে আমাকে বলে, রাত হয়েছে, শুয়ে পড়োগে যাও।

তাকে ফেলে আসতে পারি না। গভীর রাতে জ্বরের প্রকোপ কিছুটা কমে আসে। সে ঘুমিয়ে আর আমি তার পাশে বসে ঝিমুচ্ছি। ঘুম ভাঙতেই দেখে তার পাশে তখনো আমি।

সুমি আমার হাত ধরে।

আমি চোখ মেলে তাকাই।

আবার বললো, শুয়ে পড়ো, যাও। এভাবে জেগে থাকলে তোমারও শরীর খারাপ করবে।

তোমার এমন অবস্থায় দূরে গিয়ে মন টেকে না, বার বার তোমার কথাই মনে পড়বে। তারচেয়ে বরং তোমার পাশে বসে থাকাই ভালো।

ওমা তাই! কিছুক্ষণ ভেবে তারপর বললো, রাত জাগা ভালো না, যেতে যখন মন চাইছে না, এখানেই শুয়ে পড়ো।

আমি ইতস্তত করতেই ও কড়া ধমক লাগালো।

কি আর করা! শুয়ে পড়লাম তার বিছানাতেই। বালিশের এক পাশে আমি, অন্য পাশে সুমি। চোখ বুজে শুয়ে আছি। দুজনে কেউ কোনো কথা বলছি না।

এক সময় সুমি বললো, সারাটা জীবন এভাবে যদি পাশাপাশি থাকতে পারতাম!

কেন, তোমার মনে সন্দেহ আছে? বললাম।

না, তোমাকে নিয়ে আমার কোনো দ্বিধা নেই। এমনি বলছিলাম আর কি!

আরো কিছুক্ষণ কাটলো। এক সময় সুমির কোমল হাত আমার সমস্ত দেহ জুড়ে বিচরণ করতে লাগলো। পাশাপাশি শুয়ে থাকার কারণে আমার মাঝেও এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি হলো। আমি ভাবতেও পারিনি বৃষ্টি ভেজা দিনের শেষে আমার জন্য আরো বড় চমক অপেক্ষা করছে যার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।

তার আহ্বানে সাড়া দেবো কি দেবো না ভাবছি।

সুমি যেন আমার সাড়া দেয়ারই অপেক্ষা করছে।

আমি তার হাত গভীর আবেশে আকড়ে ধরলাম।

সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে লাগলো।

সে যে আমাকে এতোটা আপন করে পেতে চায়, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। আমিও সুমির প্রতিটা চুমোর প্রতিউত্তর দিতে লাগলাম। এক সময় চাওয়া-পাওয়ার পূর্ণতায় সিক্ত হলাম আমরা।

একটা ডিঙি নৌকা বদলে দিল আমার জীবন। কল্পনার রঙ তুলি দিয়ে সাজানো একটি চমৎকার সুখী জীবনের অপেক্ষায় আমরা প্রহর গুণছি। উভয় পরিবারের সম্মতিতেই আমাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন হবে।

সিলেট থেকে

রহস্য

- আকলিমা আক্তার মিতা

আমার গ্রামের বাড়ি বরিশাল। কিন্তু জন্ম ঢাকায়। তাই বলে ঢাকায় আমার সব কিছু নয়। ঢাকা থেকে আমার গ্রামের বাড়িই বেশি ভালো লাগে। গ্রামের সবুজ পরিবেশ, নির্মল দক্ষিণা বাতাস, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ছোটাছুটি, পুকুরে ইচ্ছে মতো ডুবিয়ে গোসল করা, গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়া এসবই আমার ভীষণ ভালো লাগতো। ফলে কোনো রকম সুযোগ পেলেই গ্রামের বাড়িতে চলে যেতাম। আমার এই গ্রামপ্রীতি দেখে আব্বা প্রায়ই বলতেন, আমাকে গ্রামে বিয়ে দেয়া হবে।

আব্বার ইচ্ছেই হোক কিংবা আমার গ্রামপ্রীতির ফলেই হোক, আমাকে বিয়ে দেয়া হয় গ্রামের এক স্কুলমাস্টারের সঙ্গে। এই দীর্ঘ জীবনে আমাকে বহুবার ঢাকা থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে ঢাকা আসা-যাওয়া করতে হয়েছে।

এই আসা-যাওয়ার মাধ্যম বাস থাকলেও আমাদের জন্য সুবিধা ছিল লঞ্চ। তাই লঞ্চেই যাতায়াত করতাম। এই লঞ্চ নিয়ে জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। তবে একদিনের অভিজ্ঞতার কথা মনে হলে আজো ভয়ে কুকড়ে যায়। মৃত্যুর খুব কাছে চলে যাওয়া কতোটা যে ভয়ংকর সেদিন বুঝেছিলাম।

বৈশাখ মাস। কালবৈশাখির ঝড়ে গ্রামের অনেক বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বৃষ্টিও হচ্ছে খুব, সঙ্গে প্রবল বাতাস। রেডিওতে বার বার চার নাম্বার সতর্ক সংকেত দিয়ে নদীবন্দরের সকল যানকে সাবধানে চলাফেরা করতে বলা হচ্ছে।

এ রকম একটা সময়ে আমাকে লঞ্চে চড়তে হলো। কারণ ঢাকা থেকে চিঠি এসেছে আম্মার অবস্থা খুব খারাপ, তাড়াতাড়ি যেন ঢাকায় আসি। মনটাকে কিছুতেই আটকে রাখতে পারলাম না। গ্রামের অনেকেই বোঝালেন এ রকম ঝড়ের সময় লঞ্চে না চড়াই ভালো। কে শোনে কার কথা! এক বছরের সন্তান সাহেদকে নিয়ে লঞ্চে চড়ে বসলাম, সঙ্গে স্বামী। সাহস পেলাম অন্য যাত্রীদের দেখে, তারা যদি মৃত্যুর ভয়কে পেছনে ফেলে লঞ্চে চড়তে পারে তবে আমি কেন পারবো না!

সন্ধ্যার কিছু আগে লঞ্চ ছাড়লো। ঘণ্টা তিনেক লঞ্চ ভালোই চললো, তারপরই কলার মোচার মতো লঞ্চ দুলতে লাগলো, বাতাসের তীব্রতা অনেক বেড়ে গেল। লক্ষ্য করলাম, পাশে দাড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোক বাতাসের ঝাপটায় ঠিক মতো দাড়িয়ে থাকতে পারছেন না।

বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হলো বৃষ্টি। মাঝে মধ্যে আকাশ চেরা বিদ্যুতের ঝলক। সারা লঞ্চে নীরবতা। কারো মুখে কোনো কথা নেই। দেখলাম কিছু মানুষ নামাজে দাড়িয়ে গেছে। এর একটু পরেই যেন শুরু হলো মহা প্রলয়। লঞ্চ এতোটাই দুলতে শুরু করলো যে, এক পাশ থেকে অন্য পাশে পানি যাচ্ছে ঢেউ-এর ঝাপটা দিয়ে। লোকজন আতংকিত দিশেহারা। আমার কোলে থাকা সন্তান সাহেদ বিকট চিৎকার করে কাদতে লাগলো।

নিজেকে ঠিক রাখতে পারছিলাম না। কারণ যে পাশ থেকে ঢেউ বাড়ি দিচ্ছে, লোকজন তার উল্টোদিকে চলে যাচ্ছে। লঞ্চ বিপজ্জনকভাবে এক পাশে কাত হয়ে গেল। এর মাঝে শুনতে পেলাম একজন উচু স্বরে আজান দিচ্ছেন। কেউ বা সূরা পড়ছেন। মোট কথা মুসলমান মাত্রই সবার মুখেই আল্লাহর নাম ছিল। কেননা এই বিপদ থেকে যে আল্লাহ ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারবে না সে কথা সবাই বুঝে গেছে।

দেখলাম আমার স্বামী কোথা থেকে যেন একটা লাইফবয় জোগাড় করে ফেলেছে। কিছুটা ভরসা পেলাম। কিন্তু আমার এই ভরসা নিরাশায় পরিণত হলো যখন দেখলাম কিছু লোক আমার স্বামীর কাছ থেকে লাইফবয়টা কেড়ে নিয়ে গেল। আল্লাহকে ডাকলাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রক্ষা করো। যাত্রীদের এমন বেসামাল অবস্থা দেখে কিছু আনসার বললো, আপনারা সবাই একপাশে হয়ে যাবেন না, তাহলে লঞ্চ ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যে যেখানে আছেন সেখানে চুপচাপ বসে থাকেন, আর আল্লাহকে ডাকেন।

আনসারদের কথায় কাজ হলো সবাই চুপচাপ যার যার জায়গায় বসে পড়লো। সবার মুখই মৃত্যুর ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে আছে। অনেকে জীবনের আজকেই শেষ দিন মনে করে তওবা পড়ে নিল।

আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে নিয়ে যাও, কোনো আফসোস নেই। কিন্তু আমার এই ছোট বাচ্চাটাকে বাচিয়ে রেখো, এটাই তোমার কাছে মিনতি।

বাচ্চাটাকে কোলে চেপে বসে চোখের পানি ফেলছি, এমন সময় দাড়িওয়ালা এক বুড়ো লোক আমার পাশে এসে বসলেন মা, ভয় পেয়েও না, আল্লাহ মানুষগুলোকে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু মারবে না। দাও, বাচ্চাটা আমার কাছে দাও।

ডুবন্ত মানুষ যে কোনো খুটি পেলে আটকে ধরে বাচতে চায়। সত্যি কথা বলতে কি, লোকটার কথায় এমন আত্মবিশ্বাস ছিল যে মনে হচ্ছিল তিনি যা বলেছেন সবই সত্যি। আমাদের কিছুই হবে না। আমরা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবো, নিতে পারবো পৃথিবীর নির্মল বাতাস।

বাচ্চাটাকে দাড়িওয়ালা লোকটার হাতে দিলাম। এভাবে যে কতোটা সময় পেরিয়ে গেছে মনে করতে পারবো না। ঘোর কেটে যাওয়ার পর দেখি সব কিছু শান্ত, হালকা বাতাস বইছে, বৃষ্টির চিহ্ন মাত্র নেই। আমরা সেদিন বেচে গেয়েছিলাম ঠিকই কিন্তু আমার কাছে বিরাট এক প্রশ্ন তৈরি করে দিয়ে গেছে সেই দাড়িওয়ালা লোকটা।

লঞ্চ সদরঘাট টার্মিনালে ভেড়ার আগ পর্যন্ত লঞ্চে সেই লোকটাকে খুজলাম। কিন্তু পেলাম না। তিনি কোথায় গেলেন?

আমার মনে আছে, আমার বাচ্চাটা তার কোলে দিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু আবার কখন তার কোল থেকে নিয়েছি, তা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। সেটা এক বিরাট রহস্য হয়ে রইলো আমার কাছে। তাছাড়া তিনি কেমন করে আগে জানতে পারলেন লঞ্চ ডুববে না! এটাও একটা রহস্য!

গেন্ডারিয়া, ঢাকা থেকে

ট্রলারে

- নিজাম উদ্দিন মাহমুদ

১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্র্যাক (আরডিপি)-তে পিও হিসেবে চাকরি পাওয়ার সুবাদে চাকরিতে যোগ দেয়ার জন্য নতুন কর্মস্থল কুতুবদিয়ার বড়ঘোপ অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম ইউনিভার্সিটির বন্ধু ও নতুন কলিগ নাজিমকে নিয়ে। এর আগে কুতুবদিয়া সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। তাই আমি এবং নাজিম বিভিন্নজনের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যাতায়াতের সহজ পথ বেছে নিলাম চকরিয়ার মগনামা হয়ে বড়ঘোপ রুটকে। তার কারণ, চট্টগ্রাম থেকে ট্রলারে গেলে প্রায় সাত ঘণ্টা বঙ্গোপসাগরে থাকতে হবে। মগনামা দিয়ে গেলে পয়তাল্লিশ মিনিট সমুদ্রে থাকতে হবে।

যথা সময়ে চট্টগ্রাম থেকে চিরিঙ্গা হয়ে মগনামা পৌছালাম। সেখানে পৌছে একটি ছোট নৌকা স্থানীয় ভাষায় ডেনিস আশি টাকায় ভাড়া করলাম। পরে অন্য একজন যাত্রীকে আমাদের অনুমতি নিয়ে মাঝি দশ টাকা ভাড়ায় নৌকায় স্থান দিল।

নৌকা ঘাট থেকে ছাড়ার সময় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন আমরা ছিলাম ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়া টগবগে যুবক। আমি আর নাজিম ছিলাম জিন্স ও সানগ্লাস পরা ফুলবাবু।

মাঝির ডাকে আমরা দুজন ও তৃতীয় ব্যক্তি নৌকায় উঠলাম।

নৌকায় ওঠার পর মাঝি যাত্রা শুরু করলো।

আমি আর নাজিম নৌকায় দাড়িয়ে চোখে সানগ্লাস লাগিয়ে সমুদ্রের রূপালী দৃশ্য উপভোগ করছি। নৌকা সাত আট মিনিট চলার পর হঠাৎ সমুদ্রের এক বিশাল ঢেউয়ের সঙ্গে নৌকা নিচের দিকে ঢুকে গেল। পরক্ষণে আবার উপরে উঠলো। এভাবে চলতে লাগলো নাগরদোলা পর্ব। আমরা দুজন চোখ বন্ধ করে কখন বসে পড়েছি টেরই পাইনি। কোথায় সানগ্লাস, কোথায় আমরা তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

প্যান্ট–শার্ট কাদায় একাকার। বসে বসে দুজনে যতো রকমের দোয়া–দরুদ আছে পড়তে লাগলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে লাগলাম এ যাত্রায় যদি বেচে যাই তাহলে জীবনে আর কখনো পাপ করবো না। মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকলাম। যতোবার দোয়া ইউনুস পড়তে চাচ্ছি ততোবারই পড়ছি দোয়া কুনুদ। স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের আপনজনদের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। চিন্তা করছি আমার লাশ তো আমার আপনজনেরা কখনো পাবে না। ঠিক সেই মুহূর্তে নাজিম বললো, দেখ দেখ!

আমি ফিরে তাকাতেই সে আমাকে মাঝির পাশে বসা তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিল।

দেখলাম বেটা দিব্যি আরামে বিড়িতে সুখটান দিচ্ছে।

নাজিম বললো, নিজাম, আমরা বোধ হয় বেশি ভয় পেয়েছি। মনে হয় এখানকার লোকদের জন্য এটাই স্বাভাবিক। না হলে নিশ্চিত মৃত্যুকে সামনে রেখে কেউ এভাবে বিড়ি খেতে পারে না! তার কথা শুনে একটু একটু করে প্রকৃতিস্থ হতে লাগলাম। এক পর্যায়ে ঠিকঠাক মতো কুতুবদিয়ায় পৌছালাম। এবং নির্ধারিত সময়ে চাকরিতে যোগ দিলাম। চাকরিতে যোগ দেয়ার পর মনে মনে চিন্তা করলাম, আর চট্টগ্রাম আসবো না, যতোদিন বাচি কুতুবদিয়ায় থাকবো। কিন্তু বিধি বাম। এর মধ্যে অফিস থেকে জানানো হলো, আমাদেরকে ইন–সার্ভিস ট্রেনিংয়ের জন্য কুমিল্লায় যেতে হবে।

কি আর করা! কলিগ নাজিম এবং রামকৃষ্ণকে নিয়ে ভোর ছয়টায় বড়ঘোপ ঘাট থেকে ট্রলারে করে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বড়ঘোপ ঘাট থেকে যে যাত্রী নিল তাতে ভয়ের কারণ ছিল না। যখন বড়ঘোপ থেকে ছেড়ে এসে দরবার ও ধুরং ঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলো তখন মনে হচ্ছে, একটু দোল খেলে পানি ট্রলারে ঢুকবে। ভয়ে ভেতরের নাড়িভুড়ি বের হওয়ার অবস্থা। তাই একবার ভাবলাম নেমে পড়ি। কিন্তু সহকর্মীদের জন্য তা হলো না। ট্রলার কূল ছেড়ে সমুদ্রের দিকে যাত্রা শুরু করলো।

চারদিকে শুধু পানি আর পানি। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, যদি ট্রলার ডুবে যায় তাহলে বাচবো কি করে! তাই ট্রলারে লাইফ জ্যাকেট, বয়া জাতীয় কিছু আছে কি না চারদিকে শিকারির মতো খুজতে লাগলাম। কিন্তু ট্রলারে বিপদের সময় জীবন রক্ষাকারী কোনো উপকরণই চোখে পড়লো না। শুধু নীল রঙের একটা প্লাস্টিকের বড় ড্রাম দেখতে পেলাম। বন্ধু ও সহকর্মী রামকে সেটা দেখিয়ে বললাম, রাম, যদি ট্রলার ডুবে যায় তাহলে দুজনে ওই ড্রামটিকে আকড়ে ধরবো।

রাম বললো, বোকার মতো কথা বলিস কেন, ট্রলার যদি ডুবে যায় তাহলে সব মানুষই ওই একমাত্র অবলম্বন ড্রামটি ধরতে চাইবে, এতে কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে সবার আগে ডুবে মরবি।

রামের কথায় ভয়ে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

এটা না ধরে বরং চিৎ হয়ে ভেসে থাকবি, তাহলে অনেকক্ষণ বাচবি।

তার কথার পর ভাবলাম এই ট্রলারের যাত্রীরা কতো অসহায়। যারা এসব যাত্রীবাহী ট্রলারের ফিটনেস সার্টিফিকেট দেন তারা বোধ হয় অন্ধ। তা না হলে কেন তারা বোঝেন না সমুদ্রে চলাচলকারী যাত্রীদের যে কোনো দুর্ঘটনায় বাচার জন্য ন্যূনতম বয়া, লাইফ জ্যাকেট বা বাতাস ভর্তি টিউব রাখার জন্য ট্রলার মালিকদের বাধ্য করা তাদের দায়িত্ব। ট্রলারের ফিটনেস সার্টিফিকেট পেতে হলে এগুলো থাকা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

পাহাড়তলি, চট্টগ্রাম থেকে

সুয়েজ খালে বারো ঘণ্টা

– সুমন রাজা লিটন

ভারত মহাসাগর ছেড়ে আটটি ইওরোপিয়ান দেশে যাত্রার প্রাক্কালে আমরা লোহিত সাগরের (Red Sea) উত্তাল তরঙ্গমালা পাড়ি দিয়েছি। তখন রাত দ্বিতীয় প্রহর। মুখোমুখি ইতিহাসখ্যাত সুয়েজ খাল। কনভয় মিস করায় তখনকার মতো পার হওয়া গেল না সুয়েজ। অদূরেই ওয়েটিং এংকোরেজ। নোঙ্গর করা অপেক্ষামাণ বিপুল জাহাজের সহ অবস্থানের ফলে এই নিঝুম আধার রাতেও যেন আলোর বন্যা নেমেছে পুরো এংকোরেজ জুড়ে। বেশ কিছুটা দূরে অবস্থান নিয়েছে আমাদের জাহাজ। নোঙ্গর করবো। এক সময় গভীর রাতের গুমোট নিস্তব্ধতাটা ভেঙে খান খান হয়ে গেল নোঙ্গর ফেলার বিকট শব্দে। ভোরের আলো না ফুটতেই নোঙ্গর তোলার পূর্ব প্রস্তুতি নিচ্ছিল পরবর্তী কনভয়ের ঘোষিত সব কয়টি জাহাজ। বেলা নয়টায় নানান দেশীয় সতেরোটি জাহাজের সম্মিলিত বিশাল কনভয় হয়ে আমরা প্রবেশ করলাম সুয়েজ খাল মুখে।

ফার্ডিন্যান্ড–ডি–লেসেপ্স পরিকল্পিত শতাধিক বছরের পুরনো এই সুয়েজ খাল আধুনিকতার ছোয়া পেয়ে এখন অনেক বেশি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত। লম্বায় প্রায় বিরানব্বই মাইলের এ খাল প্রস্থে মাত্র দুইশ সাতাত্তর মিটার। প্রতি বছর ড্রেজিং করার ফলে পশ্চিম পাড়ের কিনারা পর্যন্ত যেদিকে ইজিপ্ট সেদিকে বিস্তৃত গড়পড়তা গভীরতা সর্বোচ্চ ষাট ফিট। পাড় ভাঙনের প্রতিবন্ধক হিসেবে শুধু এদিকে প্রাকৃতিক পাথর আর সিমেন্টের প্রায় খাড়া আস্তর নেমে এসে সুয়েজের গভীর তলদেশে গিয়ে পৌছেছে। আজ থেকে সাড়ে তিন দশক আগেও যেখানে জনমানুষের লেশমাত্রও ছিল না সেখানে এই পশ্চিম তীর ঘেষে দীর্ঘ বিরানব্বই মাইলব্যাপী প্রায় নিরবচ্ছিন্ন সরকারি বসতি গড়ে উঠেছে। ওপারে (পূর্বে) সিনাই। বিস্তীর্ণ ধু ধু মরুভূমি ছাড়া তেমন কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু তীরবর্তী বিক্ষিপ্ত বেলাভূমি সূর্যের আলোয় চিক চিক করছে। তা ছাড়িয়ে ওপাশে এখানে–সেখানে পর্বত প্রমাণ উচু পাথরে বালির ঢিবি আর কিছু মরুদ্যান। কোথাও কোথাও দুই একটি চিড়ে চ্যাপ্টা ট্রেঞ্চ এবং যুদ্ধাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ ১৯৭৩–এর সেই রক্তক্ষয়ী ইজিপ্ট–ইসরেল যুদ্ধের অস্তিত্বকে প্রমাণ করছে।

আমাদের এসব পণ্যবাহী জাহাজের তুলনায় সুয়েজ খালের প্রশস্ততা তেমন যথেষ্ট নয়। ফলে দুর্ঘটনা এড়াতে অনেকটা শামুকগতিতে এগিয়ে চলেছে কনভয়। কয়েক মাইল অন্তর সুয়েজ ট্রাফিক কন্ট্রোলের সুদৃশ্য অফিস। কাছে–ধারেই কোথাও একটা করে স্থানান্তরযোগ্য ফ্লোটিং বৃজ কিনারা ধরে লম্বা–লম্বি পড়ে আছে। প্রয়োজনে সোজা নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে এপার–ওপার সংযোগ সাধন করা যাবে। মাইল বিশেক পেরিয়ে যখন *গ্রেট বিটার লেক*–এ পড়লাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে । ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে রোদ। সে রোদের চাপা আলোয় বাম দিকের দৃশ্যটা বেশ চমক সৃষ্টি করেছে। ওখানে সবুজের নিবিড় সমারোহ দেখে মনে হয় নির্মম এই ধূসর মরুভুমি যেন নিতান্ত করুণভাবেই হার মেনেছে মানুষের বুদ্ধিমত্তা তথা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির কাছে। এসব মরু অঞ্চলে লবণাক্ততা বিহীন নদীর পানি ছাড়াও খনি থেকে উত্তোলিত ক্রুড অয়েলের তলানি বা গাদ স্প্রে করে মিশিয়ে দেয়া হয় মাইলের পর মাইল এই বালিরাজ্যে। দীর্ঘ দিন তেল সমৃদ্ধ এসব রাসায়নিক বর্জ্য পর্দাথের সংস্পর্শে বালি তার মৌল গুণগুলো হারিয়ে যে পর্যায়ে আসে তার উর্বরতা দৃশ্যত সাধারণ মাটির চেয়ে কিছুটা বেশিই। বেড়ে ওঠা গাছ–গাছালির গাঢ় সবুজ রঙ তারই স্বাক্ষর বহন করছে। এ

পশ্চিম পাড়েই কোথাও কোথাও লক্ষ্য করলাম, বেশ কিছু জায়গা জুড়ে শিল্প–কলকারখানার জোর প্রস্তুতি চলছে। ওদিকে বিদ্যুতায়নের জন্যে শহর থেকে অনেক দূরে এখানে চলে আসা সারি সারি অসংখ্য তারের পোস্টগুলোকে মরু হাওয়া সৃষ্ট বালিয়াড়ির মধ্য দিয়ে একঝাক চিরুনির দাতের মতো দেখাচ্ছে।

আরো পরে যখন *তিমশা* হ্রদে পৌছেছি তখন বিকেল। চোখ ফেরাতেই দৃষ্টি থমকে যায় অদূরে। সে এক চোখ ধাধানো ছোট সৌন্দর্য নগরী। পাথরে তৈরি ছোট–বড় চিত্র–বিচিত্র রঙের এক তলা বিশিষ্ট (রেস্ট হাউস) ভবনগুলোকে সংস্কার সাধিত প্রাচীন ঝলমলে *রাজমহল* বলে দৃষ্টিভ্রম হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। ওগুলো ঘিরেও নাম না জানা হাজারো প্রস্ফুটিত ফুলের বাহারি সমাবেশ দেখলে মনে হয় এখন বুঝি বসন্তকাল। নিখুতভাবে তৈরি ছোট ছোট কৃত্রিম ঝরনা থেকে স্ফুটিক স্বচ্ছ পানির ফোয়ারাগুলো পুরোটা পরিবেশের জন্যে এক একটি মনোমুগ্ধকর সংযোজন। একেবারে পাড় ঘেষা বিশালকায় ভবনটি স্বকীয় অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে নগরীর মধ্যমণি হয়ে। বেশ উচুতে প্রতিষ্ঠিত এ ভবনটির নির্মাণ–সৌকর্য আর নৈপুণ্যের যথোচিত প্রশংসা করার উপযুক্ত ভাষা নেই। পাশের করিডোর হয়ে কারুকাজ করা মসৃণ পাথরের কৃত্রিম পাহাড়ি ঢাল আকাবাকা পথে নেমে এসে সুয়েজের নীলাভ পানি ছুয়েছে। সব মিলে কেমন যেন বিচিত্র রঙয়ের উত্তাল সৌন্দর্যের মাখামাখি সর্বত্র। মনোরম এ নগরীর এমন সৌন্দর্যের মাঝে হারিয়ে যাবার লোভটা সংবরণ করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল আমার। তবুও ধীর গতিতে চলা জাহাজের পাটাতনে দাড়িয়ে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম।

তিমশা হ্রদের শেষে তীরবর্তী *ইসমাইলিয়া* নামের স্থানটিকে সমুদ্র সৈকতের বিকল্প বলে অনায়াসেই চালিয়ে দেয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার উগ্র ছোয়া পাওয়া কিছু ইজিপশিয়ান তরুণ–তরুণীকে এই শীতেও সংক্ষিপ্ত পোশাকে দেখা গেল ওখানে। ওদের পদচারণা আর গগনবিদারী কলহাস্যে মুখরিত হয়ে আছে সমগ্র পরিবেশ। যেন নিষ্ক্রিয় এই মরু প্রান্তরের ঝিম ধরা আবেশে ঘুমন্ত প্রকৃতিটাকে জাগিয়ে তোলার নিষ্ফল প্রয়াস নিয়েছে ওরা।

ওদিকে এই বিকল্প সৈকতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অদূরবর্তী সুদৃশ্য পার্কটা ছিল আরেক বিস্ময়কর চমক। বিনোদনের সর্বাধুনিক উপকরণ সজ্জিত এ পার্ককে অন্য দশটা সাধারণ পার্কের সঙ্গে তুলনা না করে *ভূস্বর্গ* বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। কেন্দ্রস্থিত দৃশ্যটা বর্ণনাতীত। কৃত্রিম ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। যন্ত্রতাড়িত বাতাসের শন শন আর্তনাদ ছাপিয়ে শোনা গেল বৃষ্টির একটানা রিমঝিম শব্দ।

সময় বয়ে যেতে জাহাজও এগিয়েছে অনেক দূর। দিনান্তের নিস্তেজ আলোয় দূরবীনে চোখ রাখতেই কাছাকাছি মেটে রঙের দুটো টাওয়ার ভেসে এলো। ভরাট গায়ে বড় করে ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষায় লেখা থেকে যতোদূর বোঝা গেল, প্রথম মহাযুদ্ধকালীন কোনো বেদনা–বিধুর স্মৃতিকে বুকে জড়িয়ে দাড়িয়ে আছে ও দুটো মলিন টাওয়ার।

সুয়েজ খাল শেষ হতে তখনো বেশ কয়েক মাইল। বহুদূর মরুদিগন্তে নিষ্প্রভ সূর্যটা ঢু মারতেই পাড়লগ্ন আলোকোজ্জ্বল ইজিপশিয়ান আর্মি গারাজ চোখে পড়লো। এদিকে সন্ধ্যা নামতেই দুই পাশে জ্বলে ওঠা ফেয়ার–চ্যানেল লাইটের নির্দেশিত জলপথ ধরে সুয়েজ পেরিয়ে ভূমধ্য সাগরে পড়েছি। তখন নিকষ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে রাতের আকাশ। আমরাও ডিউটি পড়েছে রাত আটটা থেকে। মাইল দুয়েক এগোতেই অনাহুত অতিথির মতো দিগন্ত বিস্তৃত জমাট আধার নেমেছে সমুদ্র বক্ষে। সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে দাড়িয়ে আছি বৃজে। জাহাজের পানি কেটে চলার একটানা শব্দজনিত ছন্দময় সুর ভিড় করছে দুই কানে।

কৃং কৃং কৃং।

হঠাৎ ছন্দপতন।

টেলিফোনের রিসিভার তুলতেই ক্যাপ্টেনের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর, স্পিড পুরো মাত্রায় তুলতে হবে।

ইঞ্জিন রুমকে জানিয়ে টেলিগ্রাফের কাটাটা একশ ত্রিশ আরপিএম–এর ঘরে আনতেই মৃদু একটা ঝাকুনি খেলো জাহাজ। পুরোদমে ঘুরতে শুরু করেছে প্রপেলার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কফির পেয়ালার দিকে হাত

বাড়িয়েছি। আর ততোক্ষণে সূচিভেদ্য আধারের বুক চিরে সুদূর ইস্তাম্বুল বন্দরের উদ্দেশ্যে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের জাহাজ।

চট্টগ্রাম থেকে

রূপসার বুকে

- মোহাম্মদ মাহিদুল ইসলাম বিপ্লব

রূপসা নদীর পাড়েই আমাদের ঘাটি। এখানে এসেছি দুই মাস হলো। সব কিছু এখনো অপরিচিত। ছুটি পেয়ে আমি আর মনিম বের হলাম ঘুরতে। ঠিক করলাম রূপসার ওপাড়টায় যাবো। ওখানে নাকি বাজার বসে।

পদযোগে যাত্রা শুরু করলাম দুজনে। হাটতে হাটতে ফেরিঘাট এসে পড়লাম। ফেরিতে ভীষণ ভিড়। তবুও এক জায়গায় ঠাই করে নিলাম। প্রায় পনেরো মিনিট লাগলো আমাদের ফেরিতে পার হতে। ফেরি থেকে নেমে দুজনে কাচাবাজারের পথ ধরে হাটছি। এমন সময় চোখে পড়লো খোলা জায়গায় লোকজন জড়ো হয়ে কি যেন দেখছে। দেখার ইচ্ছে হলো।

মনিমকে বললাম, চলো দেখিগে কি হচ্ছে।

কাছে গিয়ে যা দেখলাম প্রথমে তা খারাপ লাগলো। একজন মহিলা আধা ছেড়া কাপড় পরে আছে। বয়স ত্রিশ–এর কাছাকাছি হবে। কাপড়ের ফাক দিয়ে তার স্তনগুলো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। মহিলাটাকে দেখে মনে হয় এখনো যৌবনের জোয়ারে টগবগ করছে তার সমস্ত শরীর।

হঠাৎ করে মনিম বলে উঠলো, এটা তো আস্ত একটা পাগলি।

পাগলি কথাটা এলাকার একজন শুনে ফেললো। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, *চুপ কইরেন, হুনলে খবর আছে*।

বললাম, শুনলে কি হবে।

লোকটি বললো, আপনাগোরে চুবানি খাওয়াইবো।

মনিম একটু উত্তেজিত হয়ে বললো, একটা পাগল আমাদেরকে পানিতে চুবাবে, আমরা কি সাতার জানি না?

বোধ হয় কথাটা মহিলার কানে গেল। মহিলা বসা থেকে দাড়িয়ে আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকালো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে নদীর দিকে দৌড় দিল। কাপড় খুলে উদোম হয়ে নদীতে ঝাপ দিল।

আমার খুব খারাপ লাগলো এমনটি দেখে। কিন্তু এলাকার কিছু লোক তাকে দেখার জন্য নদীর তীরে ভিড় করা আরম্ভ করলো। ভাবলাম দেখি মহিলাটি কি করে। সে সাতারাচ্ছে আর সাতরাচ্ছে। এ সময় প্রতিবারই তার নিম্নাঙ্গ এবং স্তন দুইটি দেখা যাচ্ছিল।

মহিলাটি সাতরে ঠিক মাঝখানে চলে গেল। মাঝ নদীতে গিয়ে একের পর এক ডুব দিতে লাগলো।

মনিম আমাকে বললো, বিপ্লব, দেখো মারা যাবে না তো!

বললাম, কিছুই হবে না। এটা তাদের অভ্যাস আছে।

এক সময় ডুব দিয়ে আর উঠছে না। হঠাৎ ভয় হলো হয়তো সে ডুবে গেছে। আমার দায়িত্বের কথা মনে হলো।

গ্রামের একজনের কাছে লুঙ্গি চাইলাম। তারা প্রথমে দিতে চায়নি। পরে পরিচয় দিলাম নৌ বাহিনীতে চাকরি করি। তখন দুজনকে দুটা লুঙ্গি দিল। লুঙ্গি পরে নদীতে নেমে গেলাম। পালাক্রমে দুজনে ডুব দিয়ে খুজতে লাগলাম। কিন্তু পাচ্ছি না। এই জায়গায় পানির গভীরতা একটু কম। তাই প্রত্যেকবারই আমরা মাটি স্পর্শ করে ফিরে আসছি।

একটু স্রোতের দিকে গিয়ে ডুব মারলাম। হ্যা, পেয়েছি। আমার হাতে মহিলাটির পা লাগলো। একটা জালের মধ্যে পেচিয়ে গেছে। জালটা জেলেদের পাতানো। পুরো উলঙ্গ শরীর। আমি আর মনিম ধরাধরি করে তীরে নিয়ে এলাম। কয়েকজনে একটা লাল কাপড় এনে ঢেকে রাখলো।

ডাক্তার এসে বললো মারা গেছে।

সবার থেকে টাকা তুলে তার জন্য দাফনের ব্যবস্থা করা হলো।

গ্রামের পুরনো গোরস্থানে দাফন করা হলো। সেখান থেকে চলে আসার পর লোকমুখে শুনতে পেলাম, মহিলার কবরস্থানে রাতে চিৎকার শোনা যায়।

এই দুর্ঘটনার পর আমার কয়েকদিন ভালো ঘুম হয়নি। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতাম।

এদিকে সিগনাল হলো জাহাজ নিয়ে হাতিয়া যেতে হবে। শুক্রবার জাহাজ হাতিয়ার উদ্দেশ্যে ছাড়লো। দেড়দিন লাগলো সেখানে পৌছাতে। প্রথম প্রথম নতুন জায়গা দেখার জন্য সবার মধ্যে একটা হিড়িক পড়ে। আমিও তা থেকে বাদ গেলাম না।

ঘুরতে বের হলাম একা পাশাপাশি একটা দোকানে বসলাম চা খাবো বলে। সেখানে কয়েকজন বয়স্ক লোকও ছিল। সবার সঙ্গে পরিচিত হতে সবার জন্য চায়ের অর্ডার দিয়েছি, কেউ কেউ না করলেন।

এক বয়স্ক লোক বললেন বাবা, আপনি কি করেন?

পরিচয় দিলাম।

আমার পরিচয় শুনে কেদে দিলেন।

বললাম, কাদছেন কেন?

অন্য লোকেরা বললো, বানের জলে তার বৌ ভেসে গেছে। অনেক দিন হলো খুজে পাওয়া যায়নি।

বললাম, দুঃখ করবেন না, হায়াত আল্লাহর হাতে। বেচে থাকলে আপনার স্ত্রীকে ফিরে পাবেন।

আমার হাত ধরে বসলেন লোকটি। বললেন বাবা, আপনি অনেক জায়গা ঘুরে বেড়ান, আমার বৌটাকে খুজে দেবেন।

সান্ত্বনা দিতে বললাম, ঠিক আছে, আমি খুজবো।

লোকটি তখনই তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি ফটো বের করলো। বললো, এটা নেন। আমার বৌয়ের ছবি।

ছবি দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এ মুখ, এ চুল হুবহু সে পাগলি মেয়েটির। কোনো এক অজানা আবেগে চোখ থেকে পানি পড়লো। বললাম, ফটো আপনি রেখে দিন, আমার চিনতে ভুল হবে না।

কিন্তু ফটো রাখতে চাইলেন না, আমাকে দিয়ে দিলেন।

তাকে কিছু বললাম না। ভাবলাম, বললে দুঃখ পাবেন।

সেখান থেকে চলে এলাম চট্টগ্রামে। একদিন সমুদ্রে ফটোটা ছিড়ে ফেলে দিলাম। মনে হলো এমন অপরাধ করেছি যা শোধরানো যাবে না। কখনো ভুলবো না সেই লোকটিকে যিনি তার স্ত্রীকে এতো ভালোবাসেন। এখনো হয়তো বসে ভাবছেন কবে তাকে খুজে পাবেন।

খুলনা থেকে

সদকা

– আবদুর রহিম

দুপুরের আগেই ফুপুবাড়ি পৌছালাম। খুব মজা করলাম। সবাই এক সঙ্গে দুপুরে খাওয়া–দাওয়া করলাম।

ঠিক আছর নামাজের পর আমরা ফুপুবাড়ি থেকে রওনা হলাম। বিকেলের পরিবেশ আরো সুন্দর। কি সুন্দর মুক্ত বাতাস প্রাণ জুড়িয়ে যায়! আমরা প্রায় বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি। একটি খালের মধ্যে দিয়ে নৌকা

এগিয়ে, খালে প্রচণ্ড স্রোত। সম্ভবত জোয়ার হচ্ছে। সূর্য তখনো ডোবেনি, ডোবে ডোবে ভাব। এমন সময় সেকান্তর কাকাকে বললাম, কাকা, আমরা তো প্রায় এসেই পড়েছি। আপনি একটু বসুন, বৈঠাটা আমার হাতে দিন। আমি একটু নৌকা বাই।

কাকা দেবেন না।

খুব পীড়াপীড়ি করছি। কাকা বাবার দিকে তাকালেন।

তিন বোনের এক ভাই হওয়াতে বাবা মা এবং বোনদের কাছে খুব আদরের ছিলাম। যে কোনো কিছু আবদার করলেই পেতাম। বাবা মৌন সম্মতি জানালেন।

কাকা বৈঠা আমার হাতে দিলেন।

বৈঠা হাতে নিয়ে যখনি খালের ওই স্রোতের মধ্যে ডোবালাম তখনি কোনো কিছু বোঝার আগেই ঘটে গেল সেই ভয়ংকর ঘটনাটি। আমি বৈঠাসহ খালের ওই স্রোতের মধ্যে পড়ে গেলাম। পড়েই ডুবে গেলাম। ভেসে উঠলাম প্রায় পনেরো বিশ হাত দূরে।

এরই মধ্যে মা এবং বোনদের আর্ত চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেকান্দর কাকা লাফিয়ে পড়ে আমাকে উদ্ধার করলেন।

ততোক্ষণে পানি খেয়ে আমার অবস্থা টেপা মাছের মতো। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল আজরাইলের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম।

মা নৌকায় বসেই একটি ছাগল মানত করেছিলেন। বলেছিলেন তার ছেলের জানের পরিবর্তে তিনিও একটি জান সদকা দেবেন। পরে বাবা একটি খাসি ছাগল কিনে এলাকার এক মাদ্রাসায় দান করেছিলেন।

সউদি আরব থেকে

ফিশিং ভেসেল

– রাজু

দুলাভাইয়ের চাকরির সুবাদে তার লবিংয়ে আমার জীবনের প্রথম চাকরিটাও জোটে একটা মাছ ধরা জাহাজে বা ট্রলারে যাকে ইংরেজিতে বলা হয় *ফিশিং ভেসেল* বা *মাছ ধরা জাহাজ*। কেউ যদি বাস্তবে না দেখে তাহলে বলতেই পারবে না কি কৌশলে জাহাজ দিয়ে জালের সাহায্যে গভীর সমুদ্র থেকে চিংড়ি মাছ ধরা হয় যা বাংলাদেশের জন্য বিদেশ থেকে রফতানিযোগ্য ওই চিংড়ি বিক্রি করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের সিলেটের কম্পানির *এফ.ভি শাহজালালে* ক্যাডেট অফিসার হিসেবে আমি জয়েন করি। বেতন মোটামুটি ভালো। থাকা অবশ্যই জাহাজে। খাওয়া-দাওয়াও কম্পানির।

জাহাজে চাকরি। তাছাড়া সাগরের গভীর থেকে গভীরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চষে বেড়ানো ইত্যাদি শুনে নিজের চাকরিকে অনেক বড় মনে হতে লাগলো। মনের মাঝে হাজারও স্বপ্ন জড়ো হতে লাগলো। পাশাপাশি সাগরের অপার সৌন্দর্য, সাগরের বিচিত্র ধরনের রূপ ইত্যাদির একটা কাল্পনিক ছবি আমার চোখে সারাক্ষণ ভাসতে লাগলো। নানা ভাবে আপন মহিমায় অদেখা সাগরের ছবি মনের ক্যানভাসে আকতে লাগলাম। ক্যাপটেন স্যার, চিফ অফিসার স্যার, আরোও যারা আছে তাদের কাছ থেকে আমার স্বপ্নের সাগরের এ কথা ও কথা কল্পনায় শুনতে থাকলাম।

এভাবে ভাবতে ভাবতে প্রতীক্ষিত সেই দিনটি এসে গেল।

আমরা কর্ণফুলি জেটি থেকে সাগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

কর্ণফুলি চ্যানেল অতিক্রম হয়ে দশ নাম্বার বয়া ক্রস করার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে চোখ পড়তেই কে জানি বললো, স্যার, এটা হলো সি-বিচ।

তৎক্ষণাৎ বাইনোকুলার দিয়ে সি-বিচের বালু এবং সারি সারি রঙ-বেরঙয়ের পাথরের সমারোহ, কিলবিল করা মানুষের ঢল ইত্যাদি দেখতে দেখতে যখন দেখলাম ক্রমেই দৃশ্যগুলো অদৃশ্য, অস্পর্শ হয়ে যাচ্ছে তখনই বুঝলাম জীবনের এই প্রথম সাগরের বুকে ভাসছি। আস্তে আস্তে আমরা জাহাজ নিয়ে গহীন সাগরের দিকে যতোই এগোচ্ছি ততোই আমার মন দ্বিগুণ বেগে পুলকিত হচ্ছে। আজীবন শুধু বইপত্রে যে সাগরের গল্প শুনতাম, আজ বাস্তবে তার বুকে, তার গর্ভে সশরীরে হাজির। সাগরের যে উত্তাল রূপের কথা শুনেছিলাম তার কোনো চিহ্নই পেলাম না। আমাদের দেশের পুকুরের পানি যেমন শান্ত থাকে সেদিন সে রকমই মনে হলো। শুধু শান্ত ধরনের অনেক বড় বড় ঢেউ যাকে *সয়েলিং* বলা হয় তা-ই দেখলাম।

সাগরের পরিসীমা যে কতো বিশাল তা নিজ চোখে না দেখলে বলা সম্ভব নয়। বিশাল সাগরে আমাদের ছোট জাহাজকে মনে হলো যেন একটি ছোট নুড়ি। দুলতে দুলতে দিন শেষে রাতের আগমন আর চলতে চলতে একেবারে গভীর সমুদ্রে বিচরণ।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পানিতে জাল ছাড়ার জন্য প্রস্তুতি। সব যখন রেডি তখন ক্যাপটেন স্যারের নির্দেশে সাগরে জাল ছাড়া হয়। আমাদের ছিল শিফটিং ডিউটি। প্রত্যেক ছয় ঘণ্টা ডিউটির পর ছয় ঘণ্টা রেস্ট। এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সাগরে পড়ে থাকতে হয়। অবশ্য মাসে একবার প্রতিটি জাহাজ দুই তিন দিনের জন্য তীরে আসতো তেল, পানি, খাবার এবং এক্সপোর্ট প্যাকিং করা মাছগুলো দেয়ার জন্য। আবার নিয়ম মাফিক যাত্রা।

আস্তে আস্তে মনে প্রথম দিকে যে পুলক জেগেছিল তা কয়েক দিনেই উবে গেল। পুলকিত হওয়ার বদলে মনে এক ধরনের নিদারুণ কষ্টের উদয় হলো। শূন্যতা চারপাশ থেকে এসে আকড়ে ধরতে লাগলো। ভাবতে লাগলাম মা-বাবা, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্য মানুষ কি করে জেলের চেয়েও বিভীষিকাময় জীবনে পা বাড়ায়!

হায়রে জীবন, হায়রে মানুষ!

কিন্তু কেউ জানে না, কেউ বোঝে না আমাদের কষ্টগুলো। আমাদের সময়গুলো কেমন চরম নিঃসঙ্গতায় কাটে। আমরা আস্তে আস্তে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, তীরের মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো আত্মিক সম্পর্ক থাকে না। মাসের পর মাস এভাবেই নীরবে নিভৃতে এক একটি জীবন থেকে কষ্টময় এক একটি দিন চলে যায়।

সাগর যখন উদ্দাম নাচ শুরু করে তখন জাহাজ অবিরাম দুলতে থাকে। তখন আমাদের প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থা করুণ হয়ে আসে। কয়েকদিন যেতে না যেতেই সাগর প্রচণ্ড খারাপ হয়ে যায়। বিশাল এক একটা ঢেউ ছোট জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়তে থাকে। মনে হয় এখনই হয়তো জাহাজ ভেঙে দুই টুকরো হয়ে যাবে অথবা ডুবে যাবে এবং কষ্টময় চাকরি জীবনের অবসান আজই হবে।

একদিন জাহাজ প্রচণ্ড রকম দুলতে থাকার দরুন আমার বমি বমি ভাব হতে লাগলো। ইতিমধ্যে দুই তিনজনের আরম্ভ হয়ে গেছে। হঠাৎ হড় হড় করে পেটের ভেতর যা আছে তা বের হয়ে গেল। কতোক্ষণ যেতে না যেতেই আবার। তখন দেখলাম ফেনা ছাড়া আর কিছুই নয়। শুনেছি অনেকে নাকি রক্ত বমিও করেছে। তারপর বিছানায়। ভাবতে লাগলাম যদি বাচি তাহলে জাহাজ তীরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি ও সাগর গুডবাই।

দুই দিন যাওয়ার পর শারীরিক অবস্থা ভালো হলো।

সবাই বললো, প্রথম প্রথম এমন হয়।

কিছু দিন পর কিনারে এলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম নেমে পড়বো। তখন ভাবলাম ভালো বেতন, যদি চাকরি ছেড়ে চলে যাই তাহলে আর কে কখন চাকরি দেবে তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে! এভাবেই বন্দী হলাম জাহাজি চাকরিতে সাগরের খাচায়।

কিন্তু না। আমাকে সাগর আপন ভাবেনি। তাই এক সময়ে ছেড়েই আসতে হলো চাকরি এবং আজীবনের জন্য সাগরকেও গুডবাই জানালাম। তবে যারা অ্যাডভেঞ্চার করতে সাগরে যায় তাদের আমাদের মতো নানান রঙের সাগরকে দেখার সৌভাগ্য হয় না। সাগর যখন শান্ত থাকে, মনে হয় দেশের কোনো পুকুরে আছি। কিন্তু অশান্ত সাগরের প্রতিটি উদ্দাম নাচের মাঝে থাকে এক একটা মানুষের মৃত্যুর হাতছানি।

আরামবাগ, ঢাকা থেকে

হিশি

- এস.ডি রোকন

তখন আমি ছোট। আষাঢ় মাস। বর্ষার অথৈই পানি চারদিক। একদিন আমি, আমার আম্মা ও আমার ছোট বোন যাবো নানার বাড়ি। আমার নানার বাড়ি আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় দশ বারো কিলোমিটার দূরে। বর্ষাকাল তাই সমস্ত রাস্তা যেতে হবে নৌকায়।

বিকাল তিনটার দিকে আমরা নানার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম নৌকায়। আমরা তিনজনসহ আরো অনেক যাত্রী ওই নৌকায় আছেন। প্রায় দুই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর আমার প্রচণ্ড প্রস্রাবের চাপ অনুভব করলাম। বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করছি। কিন্তু কোথাও হিশি করার জায়গা পাচ্ছি না। কোথাও জায়গা পেলেও শরম ও ভয়ে প্রস্রাব করছি না যদি কেউ কিছু বলে।

এই রকমভাবে প্রায় ছয় কিলোমিটারের মতো পার করেছি। তখন আর সহ্য হচ্ছে না। তখন আম্মার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে কান্না কাদছি।

আম্মা বলছেন, তোমার কি হয়েছে, কাদো কেন।

তখনো ভয়ে আম্মাকে কিছু বলছি না।

যখন সহ্যসীমার বাইরে তখন আম্মাকে কান্না কান্না স্বরে বলছি, আম্মা, আমার প্রস্রাব এসেছে।

মা বললেন, বোকা ছেলে, হিশি এসেছে, হিশি করো। তা না করে কাদছো কেন?

আমি নৌকার এক কোণায়। হাফ প্যান্ট পরা ছিল। চেইন খুলে হিশি করে প্রচণ্ড শান্তি পেলাম। তারপর সন্ধ্যায় গিয়ে পৌছালাম নানার বাড়ি।

তার দুই দিন পর বাড়ি ফেরার সময় নৌকায় ওঠার আগে ভালো করে প্রস্রাব করে নিরাপদে বাড়ি ফিরলাম।

এখনো কোথাও ভ্রমণের পূর্ব মুহূর্তে ভালো করে শরীর ক্লিয়ার করে ভ্রমণে রওনা দিই।

সিরাজগঞ্জ থেকে